KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সাবিরা চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীড় প্রকাশন
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫০/৫ ৫০/৭ ৫০/৮ ৫০/১০	Year of Publication : জুন ১৩৯৬ ॥ Sep 1989 কার্তিক ১৩৯৬ ॥ Nov 1989 অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ ॥ Dec 1989 মাঘ ১৩৯৬ ॥ Feb 1990
	Condition : Brittle Good
Editor : আবদুল হক	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচিপত্র

মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগেও স্তালিন আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের গভীর সংকট এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্তরোত্তর অগ্রগতি সম্পর্কে স্থির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী তিন দশকের ঘটনা সেই প্রত্যয়ের অনুকূলে কেন যায় নি, "স্তালিন ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী" প্রবন্ধে সেই কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

অস্ট্রিক-কোল-খাসি-দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়-আর্য এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমন্বিত ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপসন্ধানী অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া তাঁর এই ভিন্নতর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

ভারতে আধুনিক-মননের অগ্রপথিক রামমোহনের সামাজিক-সংস্কৃতিক ভূমিকার মূল্যায়ন নিয়ে দুটি গ্রন্থ-সমালোচনাভিত্তিক আলোচনা লিখেছেন ড· শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং ড· গৌতম নিয়োগী। আর একটি গ্রন্থসমালোচনা "বিজ্ঞানী প্রফুল্ল রায়ের চোখে ইসলামের অবদান"।

অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদারের পত্র "দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর"।

মানবসমাজের এক অতি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী উদগ্র অর্থলালসায় এই পৃথিবী গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বকে যেভাবে সমূহ বিনাশের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে তার ভয়াল রূপ ফুটে উঠেছে প্রদীপকুমার দাসের "প্রকৃতির প্রতিশোধ" সন্দর্ভে।

পরিবেশদূষণ-ভাবনায় প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের ভূমিকার সীমাহীন গুরুত্ব নিয়ে ড· মহাশ্বেতা চৌধুরীর ভিন্নধর্মী প্রতিবেদন "প্রতিবেশ ঃ প্রতিবেশী"।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ৮
ডিসেম্বর ১৯৮৯
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬

স্তালিন ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৪৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : এক সাংস্কৃতিক অন্বেষা সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৬৬০
প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রদীপকুমার দাস ৬৮৭

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের প্রতি বিরাম মুখোপাধ্যায় ৬৫৫
বয়সের বর্ণমালা খসরু পারভেজ ৬৫৭
গাছেদের কাছাকাছি খালেদা এদিব চৌধুরী ৬৫৮
বন্ধু রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫৯

ক্যাকটাস শচীন মুস্তফী ৬৭৭

গ্রন্থসমালোচনা ৬৯৪
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী, খালিম আহমেদ,
সুজিৎ ঘোষ

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৭১৯
প্রতিবেশ : প্রতিবেশী মহাশ্বেতা চৌধুরী

সাক্ষাৎকার ৭২৫
"কবিকণ্ঠ" আলপনা সেনগুপ্ত

মতামত ৭৩২
অমিয়কুমার মজুমদার, অশোক মৈত্র

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন। ২৭-৬৩২৭

New from Oxford

CLAUDE B LEVENSON
The Dalai Lama
A Biography Rs. 250

PRANAB BARDHAN
Conversations Between Economists and Anthropologists
Methodological Issues in Measuring Economic Change in Rural India Rs 200

F. J. A. BOUMAN
Small, Short and Unsecured
Informal Rural Finance in India
Rs. 120

ANAND A YANG
The Limited Raj
Agrarian Relations in Colonial India Saran District, 1793-1920 Rs. 185

J. R. I. COLE
Roots of North Indian Shi-cism in Iran and Iraq
Religion and State In Awadh, 1722-1859 Rs. 230

S. S. HARRISON & K. SUBRAHMANYAM
Superpower Railway in the Indian Ocean
Indian and American Perspectives
Rs. 290

JAWAHARLAL NEHRU
A Bunch of Old Letters Rs. 160
(Centenary Edition)

G. PARTHASARATHI & D. P. CHATTOPADHYAYA, *ed*
Radhakrishnan Rs. 250
(Centenary Volume)

Oxford University Press
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা ছয় টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৭০ টাকা
ষান্মাসিক ৩৫ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির উর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

স্তালিন ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক

স্তালিন মৃত্যুর এক বছর আগে—১৯৫২ সালে "সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী—রুশ দেশে" (Economic Problems of Socialism in the U.S.S.R) নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। সারা কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ওই বইটি নিয়ে আলোড়ন উঠেছিল। সকলেই বলেছিলেন—'মহামতি স্তালিন অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কী অসামান্য অবদান রেখে গেলেন।'

সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন স্থিতিশীলতা এসেছে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির অনেকটা নিরাময় হয়েছে। অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। দিকে-দিকে তখন কমিউনিজমের জয়যাত্রা। দুনিয়ার চেহারা পালটে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী-ধনতান্ত্রিক ব্যূহরচনার বিপদ (capitalist encirclement) বহুলাংশে কেটে গেছে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ স্তালিন ওই পুস্তিকা লিখতে গেলেন কেন?

ওই পুস্তিকাটি আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। তবুও কমিউনিস্ট মানসিকতা বোঝার দিক থেকে পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের দিকে তাকিয়ে আজ দেখা যাচ্ছে—ওই পুস্তিকার প্রতিপাদ্য থীসিসগুলি অধিকাংশই ভ্রান্ত। দুটি থীসিসের কথাই আলোচনা করা যাক।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, লেনিন কিংবা স্তালিন কিংবা মাও ভ্রান্ত—একথা বলার তাৎপর্য তাঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা নয়। বর্তমান যুগের আমাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, আমরা সবাই পূর্ব প্রজন্মের কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকদের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছি। কারণ, পরবর্তী কালে কী ঘটেছে তা আমরা জানি, তাঁদের জানার সুযোগ আর নেই। তা ছাড়া, যা ঘটবে বলে তাঁরা বলেছিলেন, তার তুলনা করতে আমরাই পারি, তাঁরা পারেন না।

সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসাবে স্তালিন "ধনতন্ত্রের সংকট", লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদতত্ত্ব", "সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ"-তত্ত্ব মেনে, বিশ্বাস করতেন—ধনতন্ত্র ক্রমশ-ক্রমশ সংকটে জর্জরিত হবে, আর সাম্রাজ্য না থাকলে ভেঙে পড়বে। ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী মানুষের দুঃস্থতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে (increasing pauperisation)। কোটি-কোটি মানুষ বেকার হয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে। আর তারই ফলে "বৈপ্লবিক পরিস্থিতি" তৈরি হবে। সংকটমোচনে ব্যর্থ হয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি যুদ্ধের পথ নেবে। অন্যদিকে, নানা দেশে বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠবে।

দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার চিত্রটা কেমন ছিল—১৯৫২ সালে? স্তালিন লিখেছেন—সব ধনতান্ত্রিক দেশই (পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং জাপান) কালক্রমে আমেরিকার কবলে পড়বে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়নে তলিয়ে যাবে। পশ্চিম জার্মানি আর জাপান—এই দুটি প্রধান পরাজিত দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জ্যাকবুটের তলায় নেতিয়ে পড়বে। পরবর্তী কালের ইতিহাস দেখিয়েছে স্তালিনের এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পশ্চিম জার্মানি আর জাপান 'তলিয়ে যাওয়া' তো দূরের কথা, কঠোর পরিশ্রম ক'রে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যে, ক্রমোন্নতির পথে চলেছে। এরা আজ সমৃদ্ধ দেশ। নানা সংস্কার প্রবর্তন ক'রে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশও সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছে। ধনতন্ত্রের 'সাধারণ সংকট' আছে মেনে নিয়েও বলা যায়, সাধারণভাবে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ সংকট-নিবৃত্তির নানা পন্থা-প্রকরণের সাহায্যে 'স্থিতিশীলতা' অর্জন করেছে। এসব দেশে আয়ের বণ্টন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ধনতন্ত্রের এমনভাবে পুনর্বিন্যাস ঘটেছে যার ফলে সাম্রাজ্য ছাড়াও অনেক ধনতান্ত্রিক দেশ উন্নতির পথে এগিয়েছে, তলিয়ে যায় নি।

আশ্চর্যের কথা, গোঁড়া কমিউনিস্টরা কোনোদিনই সমকালীন ধনতন্ত্রের চরিত্র, গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারেন নি। তত্ত্বের জালে আটকা পড়ে থাকায় তাঁরা দুনিয়ার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দুই

একথা ঠিক, ইতিহাসের গতিধারায় প্রকৃত যা ঘটে, তা কেউ কখনোই আগেভাগে জানতে পারে না। কেননা ইতিহাস-দেবতা পরিহাসরসিক। কিন্তু যেসব "তত্ত্ব" প্রচার করা হয় সেগুলি মাঝে-মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। পরীক্ষা করে দেখতে ব্যর্থ হলে অপরিমিত ক্ষতিই হয়। ঘটনার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে "তত্ত্ব"কে পরখ করে না নিলে "তত্ত্ব" হয়ে ওঠে ধর্মবিশ্বাসের মতো। এবং বিশ্বাস,—লৌকিক এবং রাজনৈতিক হলেও, ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায় না, যদি ওই বিশ্বাস নিয়েই রাজনৈতিক কর্মী সমাজ-পরিবর্তনের কাজে লেগে যান। চলমান দুনিয়ার দিকে তাকালে যে বিশ্বাসগুলি সেকেলে, যুক্তিহীন আর ভ্রান্ত বলে বোঝা যায়, তত্ত্বান্ধদের সেই বিশ্বাসে অটল থাকতে দেখা যায়। সেইখানেই বিপদ।

তত্ত্বে আছে ধনতন্ত্র (পুঁজিবাদ) যুদ্ধ ডেকে আনে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সংঘাত আর সংঘর্ষ হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদেরই থাকে আগ্রাসন-নীতি। সমাজতন্ত্রের নীতি সর্বদাই শান্তি।

সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ প্রসঙ্গে স্তালিন ওই পুস্তিকায় লিখেছেন, কমিউনিস্ট ও ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধতে পারে, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো বিপদের সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনা হল এই যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। হয়তো ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হবে, কিংবা আমেরিকার বিরুদ্ধে ইংল্যানড, জার্মানি প্রভৃতি যুদ্ধ করবে। স্তালিন এখানেই থামেন নি। তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, এবং বলেছিলেন, আগামী দিনের আন্তর্ধনতান্ত্রিক যুদ্ধই এ যুগের বড়ো বিপদ। এ যাবৎ ঘটনাপ্রবাহ স্তালিনের তত্ত্বকে খণ্ডন করেই চলেছে এবং আন্তর্ধনতান্ত্রিক যুদ্ধ ঘটে নি।

অন্যদিকে ইতিহাস দেখিয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশ পররাজ্য আক্রমণ করে না, কেবলই শান্তির পূজা করে—এ তত্ত্বও শুধু তত্ত্বকথাই। উদাহরণ হিসাবে চেকভূমিতে, হাংগেরিতে ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের কথা বলা যায়। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত নিয়ে বিরোধ। ছোটোখাটো কিন্তু সশস্ত্র সংঘাত, সমাজতান্ত্রিক চীনের

ভারত আক্রমণ, ভিয়েৎনামের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাত, কাম্পুচিয়ায় ভিয়েৎনামি আগ্রাসন ইত্যাদি প্রমাণ করে স্তালিনি-তত্ত্ব ভ্রান্ত, বাস্তবের নিরিখে। এই তত্ত্ব ভ্রান্ত, কেননা এর পিছনকার অর্থনৈতিক-সামাজিক বিশ্লেষণ ভ্রান্ত।

মনে হতে পারে, স্তালিনের মতো কর্মদক্ষ, ভূয়োদর্শী কমিউনিস্টের এই বিচার-বিভ্রাট ও দৃষ্টি-বিভ্রম কেন? ব্যাখ্যা এই যে, কমিউনিস্টরা সাধারণত তত্ত্বান্ধ; ফলে বদ্ধমনা। তত্ত্ব বলছে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ধনতন্ত্র অন্য সব দুর্বল ধনতন্ত্রকে নির্মমভাবে শোষণ করতে বাধ্য। সুতরাং আমেরিকার ধনতন্ত্র জার্মানি ও জাপানকে জ্যাকবুটের তলায় রাখবে। সেইজন্যই স্তালিন তাঁর চোখের সামনে যা ঘটেছিল তার তাৎকালিক ও ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। ওই একই কারণে তিনি বলেছিলেন, আন্তর্ধনতান্ত্রিক যুদ্ধই এ যুগের বড়ো বিপদ। তত্ত্বান্ধতার ফলেই ওই পুস্তিকাটিতে অস্বাভাবিক বিচারের ছড়াছড়ি।

তিন

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনায় স্তালিনের ভ্রান্ত বিচারধারা নিয়ে সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে বহু লেখালেখি হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মার্কসীয় মূল্য-তত্ত্ব পরিহার করে স্তালিন ড্যুয়েরিং (Duhring)-এর মতামত চালিয়ে দিয়েছিলেন। পাঠক এই প্রসঙ্গে 'The Law of Value under Socialism' [by G. Lischkin : Soviet Review, No. 9, Sept. 1989] প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

বর্তমানে প্রবন্ধের পরিসর এবং উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। বিচারবিভ্রাট সত্ত্বেও বৃদ্ধবয়সে স্তালিন বুঝতে পারছিলেন সোভিয়েত অর্থনীতিতে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তত্ত্বান্ধতা পরিহার করে কঠিন বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হচ্ছিলেন তিনি। যে ব্যক্তির আমলে জবরদস্তি ও অসংখ্য বড়ো চাষির শবদেহের উপর যৌথখামার গড়ে ওঠে, যাঁর নেতৃত্বে লেনিনের "নয়া অর্থনীতি" পরিত্যক্ত হয়, চালু হয় নিপীড়নমূলক এক শাসনযন্ত্র, যিনি উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিমালিকানা নির্মূল ক'রে একপার্টিনায়কতাধীন এক বিপুলকলেবর শিল্পসংস্থা গড়ে তোলেন, যিনি একদা ভেবেছিলেন বিপ্লব যখন করা গেছে, তখন, অর্থনীতির নিয়মগুলি বৈপ্লবিক অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব, তিনিই ওই পুস্তিকাটিতে কয়েকটি মূল্যবান স্বীকৃতি রেখে গেছেন।

চার

কমিউনিজমের বিস্তারের যুগে অনেক বালখিল্য কমিউনিস্টদের কথা ছিল এই: ইতিহাস সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তাতে এই রাষ্ট্র অর্থনীতির প্রচলিত নিয়ম 'বাতিল' করে অর্থনীতির 'নতুন নিয়ম' চালু করতে পারে। পণ্য-উৎপাদনব্যবস্থা, বাজারের নিয়মাবলী, দর-দামের নিয়ম, লাভ-লোকসানের নিয়ম—সবকিছুই বাতিল করতে পারে ইচ্ছামন্ত্রের জোরে।

দেখা যাচ্ছে, এই পুস্তিকায় স্তালিন বলছেন: 'তা হয় না'। তাঁর ভাষায়—কিছু কমরেড আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের নিয়মের এবং অর্থনীতির নিয়মের বাস্তবতা (objectivity), বিশেষত সমাজতান্ত্রিক সমাজে,—স্বীকার করতে চান না। তাঁরা ভাবেন, ইচ্ছে করলেই অর্থনীতির বাস্তব নিয়মাবলী 'বাতিল' করা যায়, ইচ্ছে করলেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নতুন-নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে পারে। এসব কমরেড অতিশয় ভ্রান্ত। এঁরা বিজ্ঞানের নিয়ম ও সমাজের নিয়মকে সরকার-প্রণীত আইনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। স্তালিন আরও বলছেন: বিজ্ঞানের নিয়ম কিংবা সমাজের নিয়ম প্রকৃতির কিংবা সমাজের অন্তর্লীন

প্রক্রিয়াকেই প্রতিবিম্বিত করে। এইসব প্রক্রিয়া মানুষের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অপরপক্ষে, রাষ্ট্র যে আইন আর বিধিবিধান প্রণয়ন করে, সেগুলি মানুষের অভিপ্রায়-প্রসূত।

তাহলে কি বলতে হবে, প্রকৃতির নিয়ম কিংবা আর্থ-সামাজিক নিয়ম আদিম (elemental)? এদের ক্রিয়াকলাপ কি এমনই অমোঘ যে তাদের সম্পর্কে মানুষের কিছুই করবার নেই? মানুষ কি একেবারেই ক্ষমতাহীন? স্তালিন বলছেন :

'না—একথাও সঠিক নয়।' সমাজবদ্ধ মানুষ ঠুঁটো জগন্নাথ নয়। অর্থনীতির নিয়মাবলীকে ভালো করে 'জেনে' এবং তাদের উপর 'নির্ভর করে' সমাজ যা পারে তা হচ্ছে এই—তাদের কার্যকারিতার প রসর হ্রাস করতে পারে। আরও পারে, সমাজের স্বার্থে তাদের কাজে লাগাতে। উদাহরণ দিয়ে স্তালিন বলছেন, নদীতে প্লাবন হয়। সেই প্লাবন আটকাবার জন্য বিধিব্যবস্থা যেমন নেওয়া যায়, তেমনি অর্থনীতির নিয়মের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিধিব্যবস্থা নিতে পারে মানুষ।

স্তালিন আরও বলছেন :

যাঁরা মনে করেন যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে অসাধ্যসাধন করা সম্ভব তাঁদের বক্তব্য এই যে, সুষম বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে অর্থনীতির প্রচলিত নিয়মগুলিকে সম্পূর্ণ বাতিল করা প্রয়োজন। স্তালিন বলছেন : আমাদের দেশে 'সুষম বিকাশের নিয়ম' এমন সম্ভাবনা আর ক্ষেত্র তৈরি করেছে যার ফলে যোজনাপর্বদগুলি সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পনা সঠিকভাবে রচনা করতে সক্ষম। কিন্তু সম্ভাবনা (possibility) আর বাস্তবতা (actuality) এক জিনিস নয়।

শেষের কটি কথা থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের প্রেরণা। স্তালিন বলছেন : সুষম বিকাশের নিয়মের চাহিদা আমাদের বার্ষিক আর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূরণ হচ্ছে—এমন কথা বলা যাবে না।

পাঁচ

এখানে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। যুদ্ধোত্তর কালে ধনতান্ত্রিক দেশের—যথা, ইংল্যানড, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানি, জাপানের অভূতপূর্ব বিকাশ যে হবে, স্তালিন তা বুঝতে পারেন নি। নানা প্রকরণপদ্ধতির সাহায্যে সম্পদের পুনর্বিন্যাস, সামাজিক কল্যাণের বিপুল বিস্তার, ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের আপেক্ষিক মানবিকীকরণ যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার চেহারা অনেক-খানি পালটে দেবে, স্তালিন তাও বুঝতে পারেন নি। কেননা তত্ত্বে আছে পুঁজিবাদ সংকটে হাবুডুবু খাবে। আবার তত্ত্বে আছে, সমাজতন্ত্রের নিয়মই হল 'সুষম বিকাশ'। উন্নতির পথে অবাধ জয়যাত্রা। বৃদ্ধ বয়সে স্তালিন দেখলেন—সোভিয়েত দেশে 'সুষম বিকাশ' হচ্ছে না, সোভিয়েত অর্থনীতি নানা সমস্যার ভারে জর্জরিত। এই স্বীকৃতি মূল্যবান।

এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার ইতিহাসের দিকে একটু তাকানো যাক। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে দেশগঠনে ব্রতী হয়। ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ক'রে শিল্প-কারখানা, সব-কিছুকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করে। ১৯১৮-২১, এই পর্ব "যুদ্ধরত সাম্যবাদ" এর যুগ হিসাবে চিহ্নিত (War Communism)। এই পর্বে দেশী-বিদেশী সব ঋণ বাতিল করা হয়। জমির জাতীয়করণও হয়। সরকার জমি জাতীয়করণ করে এবং জমিবণ্টন ও জমিব্যবহারের দায়িত্ব কৃষকসমিতির উপর ন্যস্ত করে। ব্যক্তি-মালিকানাধীন কলকারখানা ও অন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সরকার অধিগ্রহণ করে এবং উৎপাদন, কেনাবেচা, বণ্টন—সমস্ত কিছুর দায়িত্ব পার্টির প্রভাবাধীন শ্রমিকদের উপর অর্পিত হয়। অবশ্য ওই সময়, অর্থনীতির চাপে, সরকারকে বেশি-বেশি কাগজি টাকা ছাপাতে হল। ফলে দেখা দেয়

মুদ্রাস্ফীতি। তখন সরকার কৃষকের বাড়তি ফসল জোর করে দখল করে বলে যে, শিল্প-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ফসলের দাম শোধ দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকর হয় নি। কেতাবি অর্থে, বৈপ্লবিক উদ্দীপনার দিক থেকে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিমালিকানার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন ঠিকই ছিল। কিন্তু তখন কমিউনিস্টরা বোঝেন নি যে অর্থনীতির নিয়ম "বস্তুগত", বিষয়িগত (subjec-tive) নয়। যুদ্ধরত-সাম্যবাদী পর্বে দেখা গেল, শ্রমিকরা কারখানাশিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং ১৯২০ সালে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়ে যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশেরও কমে দাঁড়াল। রেলওয়ে-ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল; কারণ দক্ষ শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির অভাবে সারাই-মেরামতির কাজ সম্ভব হচ্ছিল না। পরিণতিতে দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থার সৃষ্টি হল। লক্ষ-লক্ষ লোক মারা গেল। বিদেশ থেকে সাহায্য আসায় আরও লক্ষ-লক্ষ মানুষ বেঁচে গেল। এহেন অসম্ভব অবস্থায় লেনিন "যুদ্ধরত সাম্য-বাদ" [War Communism]-কে পরিহার করে "নয়া অর্থনীতি" (N.E.P.) চালু করলেন। এই পর্বের মেয়াদ ছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত।

এই অর্থনীতিতে খোলা বাজারে কৃষকদের ফসল কেনা-বেচার অধিকার দেওয়া হল। মুনাফা অর্জনেরও কোনো বাধা রইল না। অবশ্য কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ সরকারের কাছে বিক্রি করতে হত। পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, খনি এবং বৃহদায়তন শিল্প-কারখানার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বহাল রইল ঠিকই। তবে ক্ষুদ্রশিল্প আর ছোটো কারখানার ব্যক্তি-মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। সরকার বিদেশী মূলধনকে আমন্ত্রণ জানাল রাশিয়ায় লগ্নি করতে। বিদেশী মূলধনীদের আরও বলা হল, আপনারা এদেশে বেশি-বেশি মূলধন লগ্নি করুন এবং রাশিয়ার শ্রমিকদের শিক্ষিত আর কর্মদক্ষ করে তুলুন। ১৯২৪ সালে নতুন মুদ্রার প্রচলন হল। লেনিন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'ধনতন্ত্রে আংশিক প্রত্যাবর্তন' হিসাবে।

ধনতন্ত্রে এই আংশিক প্রত্যাবর্তনের ফলে রাশিয়া ধীরে-ধীরে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং যুদ্ধরত সাম্যবাদের কুফল কাটিয়ে উঠতে অনেকখানি সমর্থ হল। কৃষি-উৎপাদন ও শিল্পোৎপাদনে বিশেষ উন্নতি দেখা গেল। উৎপাদন পৌঁছল প্রায় প্রাক্-যুদ্ধকালীন অবস্থায়। তাহলেও উৎপাদন ছিল চাহিদার তুলনায় অনেক কম। রাশিয়ার জনসংখ্যা তখন পনেরো কোটি। দেশে তখন ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে চল্লিশ লক্ষ টন, জুতো তৈরি হচ্ছে তিন কোটি। কিন্তু নয়া অর্থনীতির (N.E.P.) দৌলতে "নেপ-ম্যান", "নেপ-মানুষ" নামে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় হল, আর গ্রামাঞ্চলে উদয় হল এক সম্পন্ন কৃষকসম্প্রদায় যাদের রুশভাষায় বলা হয় কুলাক।

ছয়

সোভিয়েত ইতিহাসে ১৯২৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত স্তালিনি বিপ্লবের যুগ। এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ-যোগ্য। এক : 'ডিকটেটরশিপ অব দি প্রলেতা-রিয়েত'-এর রূপান্তর ব্যক্তির স্বৈরাচারী শাসনে। দুই : তথাকথিত "দক্ষিণ" ও "বাম" বিরুদ্ধবাদীদের সম্পূর্ণ উৎসাদন ও নিধন। তিন : 'সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়'—এই তত্ত্বের আড়ালে বলপ্রয়োগে কৃষির যৌথী-করণ। চার : কৃষককে শোষণ ক'রে জবরদস্তির পথে ভারী শিল্প, বিশেষত সামরিক শিল্প স্থাপন। পঞ্চম : জাত্যভিমান ও জাতীয় শক্তির গুণগান। ষষ্ঠ : সমস্ত প্রচারমাধ্যমের উপর রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন।

রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত ১৯২৮ সালে। ১৯২৮ থেকে আরম্ভ করে স্তালিনি প্রকরণ-পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থনীতি চালিত হয়েছে

ব্রেঝনেভ যুগ পর্যন্ত। আগেই বলেছি, স্তালিনি নীতির দুটো বড়ো কথা—জোরজবরদস্তি করে হলেও যৌথ খামার গড়ে তুলতে হবে; আর কৃষককে শোষণ ক'রে হলেও অতিদ্রুত ভারী শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এই নীতির বিরুদ্ধে বুখারিন সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় বিকাশের স্বার্থে যা করণীয় তা হল এই :

প্রথম, স্বাভাবিকভাবে 'বাজারের লেনদেন' চালু করা। বাজারের দর-দামকে নিজস্ব নিয়মে কাজ করতে দেওয়া। এর ফলে দানাশস্যের দাম বাড়তে পারে, কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির, কাঁচামালের আর রুটির দামও বাড়তে পারে, তবুও।

দ্বিতীয়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কৃষক যে ফসল বিক্রি করবে, তাই কেনা। এবং এই কেনার ব্যাপারে বড়ো কৃষকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করা। মাঝারি আর ছোটো কৃষক এই বলপ্রয়োগ সমর্থন করলেও শস্য-সংগ্রহে বলপ্রয়োগ কাম্য নয়।

তৃতীয়, ছোটো-ছোটো খেতখামারের (যার মালিক ব্যক্তি-কৃষক) বিকাশে সহায়তা করা, প্রয়োজনবোধে যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের 'বিকাশের হার' কমিয়ে।

চতুর্থ, দানাশস্যভাণ্ডারে ঘাটতি দেখা দিলে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানি করা।

পঞ্চম, যদি খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করবার অর্থসংস্থান না থাকে, তবে 'শিল্পবিকাশের হার' মন্থর করা। তা না করলে কৃষিব্যবস্থা ধুঁকতে থাকবে এবং ক্ষয়ের পথে যাবে।

'দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি' বলে স্তালিন বুখারিনের প্রস্তাবাদি সম্পূর্ণ বাতিল করেন এবং তখন থেকেই স্তালিন-নীতি সোভিয়েত অর্থনীতির দিগ্‌দর্শন হয়ে ওঠে [লেনিনবাদের সমস্যাবলী স্তালিন : "কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি" পঠিতব্য]

সাত

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের (অল্পাধিক সব সমাজতান্ত্রিক দেশেরই) অভিজ্ঞতায় আজ প্রকট হয়ে উঠেছে কয়েকটি দুর্বলতা। এই দুর্বলতা স্তালিনি নীতিরই ফল।

প্রথম, কৃষির ক্ষেত্রে; দুই, ভোগ্যপণ্য সববরাহের ক্ষেত্রে; তিন : পরিচালনার ক্ষেত্রে; চার : আধুনিক প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রে; পাঁচ : বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে; ছয় : এদেরই সম্মিলিত ফল হিসাবে, জাতীয় অর্থনীতির সুষম বিকাশের ক্ষেত্রে।

আজ দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাহাত্তর বছর ধরে (অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হল। কেন? এই প্রশ্নের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা প্রয়োজন। পতিত জমি উদ্ধার করায় রাশিয়ায় কর্ষণ-যোগ্য জমির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌথ-খামার স্থাপিত হয়েছে অনেকদিন,—রাষ্ট্রীয় খামারও। জমির চাষবাসে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগও হয়েছে। অন্তত, তত্ত্বে, রুশসমাজে বৈরিতামূলক (antagonistic) শ্রেণী নেই, শ্রেণীসংঘাতও নেই। কিন্তু খেতে-খামারে রাশিয়া যা উৎপন্ন করে, তা দেশের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। আমেরিকার তুলনায় তো বটেই, অনেক উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায়ও, ওই দেশের কৃষি-উৎপাদন অনেক পিছিয়ে। তাই এখনও রাশিয়াকে প্রায়ই বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

সত্যি কথা, রাশিয়া আজ শিল্পোন্নত দেশ। সামরিক শিল্প এবং সহায়ক ভারী শিল্পের নানা ক্ষেত্রে রাশিয়ার শিল্পবিকাশ সামান্য নয়। কিন্তু স্তালিনি নীতির দায়ভাগ বহন করতে হচ্ছে বলে, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে আজও অপ্রতুলতা। শিল্পের নানা শাখায় সুষমতার (balance) অভাব, উৎপন্নদ্রব্যের গুণ-মানের ঘাটতি, শিল্পপরিচালনায় অযোগ্যতা, বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানোর অক্ষমতা, শিল্পের

ও ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণে ব্যর্থতা—সব মিলিয়ে দেশে-দেশে আজ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট ক্রমবর্ধমান।

আট

অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্তালিনি উত্তরাধিকার সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিশেষ ক্ষতি করেছে। সোভিয়েত সংবাদ-মাধ্যম জানাচ্ছে যে—'ষাট বছরের মাফিয়া শাসন,—লেনিনের মৃত্যু (১৯২৪) থেকে গোর্বাচভের উত্থান পর্যন্ত; শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি, যার ফলে সন্ত্রাস, হিংসা এবং দুর্নীতি……

একতাহীন, ক্ষয়িষ্ণু এক কমিউনিস্ট পার্টি যার নেতৃত্বে কেরিয়ার-গঠন-প্রয়াসী মানুষদের সমাবেশ; ভীষণ খাদ্যাভাব, জ্বালানির অভাব, প্রায় সব নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীরই অভাব; শতকরা ১০ থেকে ১৫ মুদ্রাস্ফীতির হার যদিও কড়া নিয়মশৃঙ্খলার অভাব নেই; বিরাট বাজেটের ঘাটতি ··প্রায় ২৮,০০০ শিল্পসংস্থা উঠে যাবার মুখে, কেননা তাদের কেবলই লোকসান, যে লোকসানের পরিমাণ ২০ বিলিয়ন রুবল। অন্যদিকে ব্যাপক জাতিগত অশান্তি, বল্টিক এবং আর্মেনীয় জাতিসত্তাগুলির বিচ্ছিন্নতার দাবি··· ···সোভিয়েত সংঘে ভাঙন—পোলানড, হাঙ্গেরি, এমনকী পূর্বজার্মানির সতৃষ্ণ নয়নে পশ্চিমের দিকে ধাবিত হবার বাসনা।' মস্কো নিউজ সোভিয়েত রাশিয়া, ট্রুড, এই ধরনের পত্র-পত্রিকার পাঠক সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের এই করুণ চিত্রের সঙ্গে পরিচিত [ব্রিংজ্, সেপ্টেম্বর ৩০ দ্রষ্টব্য]।

স্তালিনি অর্থনীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—এর ফর্দ করা কি সম্ভব? অভিজ্ঞতা থেকে আজ কমিউনিস্ট মহলে এই ফর্দ করবার প্রয়াসে দেখা গেছে।

প্রথম, এই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত, অতিকেন্দ্রিকতার ভারে বিপন্ন,

দ্বিতীয়, একপার্টিনায়কতার সমাজে এই অতি-কেন্দ্রিক অর্থনীতির রূপান্তর ঘটে হুকুমদারি অর্থ-নীতিতে (command economy)।

তৃতীয়, সমাজতন্ত্রের নামে স্থাপিত হয় রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য—দরদাম-নির্ধারণে, মজুরি বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে, উৎপাদনে, বণ্টনে, ব্যবসায় পুঁজিসঞ্চয়ে, পুঁজিলগ্নিতে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে এক বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্র,

চতুর্থ, অর্থনীতির বস্তুগত নিয়ম বাতিলের তাগিদে যে "বদ্ধ অর্থনীতি" গড়ে তোলা হয়, তা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ভর্তুকি অর্থনীতিতে (subvention)।

পঞ্চম, অতিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিতে বাজারের অর্থনীতির আমূল রূপান্তর ঘটে, গড়ে ওঠে ক্রেতা-ভোক্তা অর্থনীতি। রাষ্ট্রই এই অর্থনীতির সঞ্চালক শক্তি। স্তালিনি সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রই পরি-কল্পনা রচনা করে।

রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত কিছুরই কর্তা, রাষ্ট্রই মূলধন সঞ্চয় করে, নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ ক'রে। এসব কাজ চালাবার জন্য সমাজতন্ত্রে তৈরি হয় এক বিপুল আমলা-বাহিনী। একপার্টিনায়কতার স্তালিনি ধরনের সমাজতন্ত্রে আমলাতন্ত্রের স্বাধীন ক্ষমতা তুলনায় কম। নেপথ্যে থাকে যে পার্টি ও শাসককুল তাদের হাতে আমলাতন্ত্র যন্ত্রই। কিন্তু সময় আসে যখন এই বিপুল, বিরাট আমলাতন্ত্র এক নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় এবং স্বতন্ত্র শক্তি হয়ে ওঠে। স্তালিনি ধরনের সমাজতন্ত্রে সর্বত্রই এই আমলাতন্ত্র প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে কথাটা এই যে স্তালিনি দর্শনের একটা বিশ্বাস ছিল সমাজকে বলপূর্বক সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলা। এই দর্শন থেকে এসেছে জবরদস্তির অর্থনীতি।

সব মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আজ সংকটের কবলে পড়েছে। অথচ যুগটা তাপ-পার-

মাণবিক, প্রযুক্তিনিবিড় এবং বার্তাসমৃদ্ধ। অর্থনীতিও আজ শুধু স্থানীয় নয়, আঞ্চলিক নয়, এমনকী জাতীয় নয়—আন্তর্জাতিক। আজকের দুনিয়ায় বদ্ধ সমাজ, বদ্ধ অর্থনীতি, বদ্ধ মানসিকতা অচল।

স্তালিনি তত্ত্বের দাস হয়ে, প্রত্যয়ের নিগড়ে বাঁধা পড়ে কোনো ছকে-বাঁধা ঢঙে সমাজতন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা যেখানেই হয়েছে, সেখানেই এসেছে ব্যর্থতা। দুনিয়াকে বুঝতে গেলে, সমকালীন ধনবাদকে ভালো করে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে—সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা কেন। বুঝতে হবে মানুষের জন্য সমাজ, এবং এও মনে রাখতে হবে—জোরজবরদস্তি করে মানুষকে সুখী করা যায় না।

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের প্রতি

বিরাম মুখোপাধ্যায়

ভাস্কর্য হওনি তুমি। বেদীও না। পাথুরে আকৃতি-
আদলের অবচ্ছিন্ন কিছু সুরাসার পান-শেষ
ঠোঁটের পিপাসাপুঞ্জ। অবয়বে ক্ষয়িষ্ণু বয়স
সুখদা মোক্ষদা রেখাবলি ক্ষোভের জর্জর-দীর্ণ

শব্দচূর্ণ ছেনির আঘাতে জঙ্গমের হাহাকার
অথবা ফোঁপানো চাপাকান্না আম্রপালি অনুষঙ্গে
জ্ঞানাঞ্জন থেরিগাথা বাজবে না প্রত্যাশীর কানে
আর,—বোধিসত্ত্ব অন্বিষ্টের অমৃত-ভিক্ষুর আর্তি।

প্রেয়সীকে যা দেবার ইন্দ্রিয়ের সমূহ আরতি
মর্মোদ্ধার অপাঙ্গের মুদ্রাবন্ধে আক্ষেপের খেদ
কাল মুছে দ্যায়; ক্লান্ত শ্রমণের পথের দীর্ঘতা
মাটির ও মানুষের পেয়েছো আদুল আলিঙ্গন?

গন্তব্য ছুঁয়েছো? বেলাবেলি চড়াই উৎরাই ভেঙে
ক্লান্তিকে শান্তির মূল্যে স্নায়ু আর আয়ু কি মেনেছে?
শেষ-শীতের শিশিরে শিল্প ধুয়ে মুছে খাঁ-খাঁ চোত্
সজ্জনের ছাতার নিচেয়, আহা, ছায়া চলমান।

মসৃণ খাগ্-এর লিপি রঙতুলি কিশোর স্বপ্নেরা
আগ্রহে উদ্যত ছিলো শিল্পসারাৎসার হবোই—
অসূক্ষ্ম আঁচড়ে মোটা ব্রাশে আনাড়ি ছেনির অগ্নি-
স্ফুলিঙ্গের দ্যুতিময় গ্যেটে বতিচেল্লি রঁদা নই,

স্বপ্নের প্রসূতি মৃত। প্রবুদ্ধ সুন্দর হইনি তো
সুন্দরের বঞ্চক আড়ালে হেরোইন্ পাছারের
আড়ত ও ঠেক্ আমি জ্ঞানপাপী অংশীদার
বমাল পড়ি নি ধরা, বাঁচিয়েছে সুচারু মুখোশ।

কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া তোমার তো অভীষ্ট ছিলো না
যাবতীয় সমজীবী প্রতিবন্ধী অকান্ত সঙ্গীরা
পঙ্‌ক্তিভোজী কঠিন শ্রমের অন্নে, আর শীর্ণ হাত
সুরদাস-সদৃশের পারাপারে বন্ধু;—অঙ্গীকার

আখরে নখরে ধার, শিল্পলীল মৌলিক সত্তার
কতোটুকু উপার্জন তুমি—বয়সের ক্রীতদাস
এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাথরের বুকে অলীক রেখারা—
অলৌকিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভাস্কর্য হও নি॥

বয়সের বর্ণমালা

খসরু পারভেজ

বয়স আমার বায়সপাখির মতো তীক্ষ্ণ ঠোঁট
খুঁটে খায় নিয়তির খাদ্য সমুদ্রের ঋক্ষ স্বাদ
জীবনের গায়ে জড়ানো অনেক হিম-হর্ম্য কোট।
কবিতার কাছে ততটুকু আছে প্রস্থ সংবাদ।

বয়স আমার সারারাত জাগে সাহসী শরীর
একটি বৃক্ষের পাতাঝরা গান শোনে অন্ধকারে
ইতিহাস ছুঁয়ে গেলে বছরের বানভাসা তীর
সুহাস যৌবন বুকে নিয়ে বেড়ে ওঠে সংসারে।

আমি জীবনকে দেখেছি পথের কাছে ওরা ঋণী
ভাঙতে ভাঙতে গড়ে যায় পৃথিবীর কালদেহ
একদিন পালটে যাবে পথ সময়ের বিকিকিনি
তবুও জীবন-মৃত্যু-পথ কাউকে বোঝে না কেহ।

বয়স আমার রমণীর বুকে প্রিয়তম রাত
সন্তানের দীপ্র মুখ বেদনাবিস্মৃত অভিঘাত।

বাংলাদেশ

গাছেদের কাছাকাছি

খালেদা এদিব চৌধুরী

এই তো দাঁড়িয়ে আছি গাছেদের খুব নিকটে
জানাতে পারি নি দীর্ঘ পথযাত্রার কথা
এখানে থেমে গেছে পথচলাচল
তাই অরণ্যশ্যামল দিন আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি,
নিবিড় নদীর স্রোতে ভেসে যায় যত অভিমান।

গাছেরা ঠিকানা জানে না
তাই ফিরে আসে চিঠি, মানুষের গোপন বারতা—
চিনতে পারে না পথ, অরণ্যধূসর ছায়ায়
ক্লান্ত শিথিল চোখ বড়ো জ্বালা করে—
মরে যায় বাসনার সমর্পিত আকুল আবেগ
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু স্মৃতির রোমন্থন
কত কষ্টের জানি না,
ভালোবাসা শুধু ঠিকানাবিহীন হয়।

তাই গাছেরা অহংকারী মুখ ফিরিয়ে রাখে
আমি দাঁড়িয়ে আছি
খুব অন্তরঙ্গ নিগূঢ় উপলব্ধি নিয়ে
কষ্ট পেয়ে কতদূরে যাওয়া যায় আর!

ভালোবাসা তো পাথর হয়ে যায়
গাছেদের দূরত্বে থাকে নির্জন একাকী শোক
কত ব্যাকুলতা, কত কষ্ট, কে জানে!
বিজন অরণ্যে এমন কাহিনীর দীর্ঘ তরুলতা।

হে বৃক্ষ, তুমি অপেক্ষা করতে পার
এত নৈকট্য কি সব সময় আকর্ষণীয় হয়?
এত কাছে আসা; এত ভালোবাসা! সুখ!
সব সময় কি ঠিকানাবিহীন হয়!

নির্জন খামের ভেতর পাথরের চোখ পড়ে থাকে।

বাংলাদেশ

বন্ধু

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্ত্রশূন্য বন্ধুগণ—অস্তিগত প্রাণ,
শোনায় যা সারাদিন সারারাত্রি ধরে,
তার কিছু বিসংবাদ, মণ্ডুকের গান
বাকি সব, ধৈর্য নেই কোথাও অন্তরে।

আমি শুনি, বাধ্য হই শিষ্টাচার মেনে;
অন্ধকারে নেমে যাই—কার হাত ধরি?
কার হাত, মাথামুণ্ডু কিছুই না জেনে
অনির্বচনীয় এক স্পন্দনেই মরি।

অস্ত্রহীন দাঁড়িয়েছে নম্র এই প্রাণে,
মুগ্ধ যেই দাঁড়িয়েছে শূন্যে একা, আর
প্রগল্‌ভের প্রশংসা আমার সম্মানে
শব্দ খোঁজে, না হয় সে বাক্যহীনতার।
আজ থাক বন্ধুগণ, অসঙ্গত টান;
জমজমাট এই জন্ম হোক না কুরবান।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : এক সাংস্কৃতিক অন্বেষা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

এক : প্রস্তাবনা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রধান পুরুষ রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রথম বই *The Origin and Development of the Bengali Language* দু-খণ্ডে প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই, বাঙলার সারস্বত সমাজে তো বটেই, সর্বভারতীয় বিদ্বানসমাজেও তিনি একটি বিশেষ সম্মানের আসন অধিকার করে নেন। তখন তাঁর বয়স ৩৬; কিন্তু বইটি লিখেছিলেন পাঁচ বছর আগেই লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে গবেষণাপত্র হিসেবে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে কোনো একটি আধুনিক ভাষার জন্ম এবং বিকাশের বৃত্তান্ত প্রণয়নে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম পুরুষও বটে। তাঁর বিদ্যাচর্চার মুখ্য বিষয় ছিল ভাষাতত্ত্ব আর ধ্বনিতত্ত্ব এবং এই বিষয়ে ৩০ বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদে অধ্যাপনা করে ওই পদের বিপুল মর্যাদা নির্মাণ করেন। ভাষা এবং ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবাদপুরুষ হিসেবে তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি থাকলেও তিনি নিজেকে কখনো-কখনো সাহিত্যের শ্রমিক বলে পরিচয় দিতেন। সাহিত্যেও তাঁর বিলক্ষণ পরিজ্ঞান ছিল। বিশেষত *Languages and Literatures of Modern India* এবং *World Literature and Tagore* বই দুখানির মতো একান্তভাবে সাহিত্যবিষয়ক বই লেখার জন্যে যে ধরনের বহুব্যাপ্ত সাহিত্যপাঠ প্রয়োজন তা প্রকৃতই বিস্ময়কর—এক্ষেত্রে তাঁর তুল্য অন্য কোনো অভিজ্ঞ পাঠকের কথা মনে আসে না। আরও বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি শৈশব থেকেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সেই শারীরিক প্রতিবন্ধকে প্রতিজ্ঞা আর প্রতিভা দিয়ে জয় করেছিলেন সুনীতিকুমার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভাষাচার্য উপাধি দান করেছিলেন এবং এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে সাহিত্যবাচস্পতি উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ভাষা আর সাহিত্যের পরিধির বাইরেও সুনীতি-

কুমারের অন্য নানাবিধ পরিচয় আছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বের সংস্কৃতি তথা সাধারণভাবে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার এক অসাধারণ বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। হস্ত, স্বর ও মস্তিষ্কের সংযোগে মানুষ যত ভাবে নিজেকে প্রকাশের চেষ্টা করে, সেই সমস্ত প্রকাশ সম্বন্ধে এমন দুর্মর আগ্রহের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। মানুষের আত্মপ্রকাশের সমস্ত চেষ্টার পেছনে তিনি দেখেছেন মননের উন্নতি আর সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সাধনের সংগ্রাম। ফলে, শুধু ভাষা আর সাহিত্যের আলোকে সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বকে অবলোকনের চেষ্টা করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা অংশমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে; তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্যক স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে তাঁর বিভিন্ন আগ্রহের বৃত্তান্ত এবং তাঁর মুখ্য রচনাবলীকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের "শব্দতত্ত্ব" পড়ে সুনীতিকুমার ভাষাচর্চায় অনুপ্রাণিত হন। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা আর মানবিকতার সমন্বয়, অবনীন্দ্রনাথ আর ভারতীয় শিল্পসাধনার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য দেশের শিল্পসাধনা প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর চিন্তাভাবনাকে অনেকখানি অধিকার করেছিল, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভাষাই ছিল তাঁর অদ্বিতীয় আগ্রহের বিষয়। ভাষাতত্ত্বে দীক্ষাদাতা রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ আহ্বানে তিনি ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় ভারত অর্থাৎ মালয়, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ আর প্রতর ভারত শ্যামদেশ বা থাইল্যানড ভ্রমণের সঙ্গী হন। সুনীতিকুমারের জীবনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ভ্রমণকালে তিনি লাগাতার অগস্ট থেকে অকটোবর তিন মাস রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এই সান্নিধ্য সুনীতিকুমারের পরবর্তী জীবনের কৌতূহল, বিদ্যাচর্চা আর জ্ঞানসাধনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উচ্চারিত আর লিখিত রূপে মানুষের আত্মপ্রকাশের যে মাধ্যমটিকে ভাষা বলি, তার বিচার আর বিশ্লেষণে সুনীতিকুমারের নিবেদিত জীবনের লক্ষ্য এই ভ্রমণের পরিণামে পরিবর্তিত হয়—একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

মানুষের আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম ছিল যাঁর বিশেষ বিষয়, এই দ্বীপময়ভারতপরিক্রমার কালে তিনি মানুষের আত্মপ্রকাশের সবগুলি মাধ্যম সম্বন্ধে, এবং শুধু সবগুলি মাধ্যম সম্বন্ধেই নয়, মানুষ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মনে হতে পারে, যিনি সারা জীবন ধরে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন-নতুন গবেষণা আর নিষ্পাদনা দিয়ে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটিকে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করে তুলবেন বলে আশা করা গিয়েছিল, তিনি মাঝপথে নেতৃত্ব পরিহার করে অনুসারীদের হতাশ করেছেন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার প্রথম জীবনে যে সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তার পরিপূর্ণতা আর অপরিপূর্ণতার অর্থাৎ পরিণতির বিচার ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিকরা করবেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞতার যুগে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে বিশেষজ্ঞদের সমাজ-সংসার পরিত্যাগ করে যিনি মানুষের সামান্য পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির সামগ্রিক স্বরূপ এবং জীবনের গূঢ়তর তাৎপর্য অন্বেষণে অভিযান করেন, তাঁর সাহস আর মহত্ত্ব অনুধ্যেয়। এবং ভাষাতাত্ত্বিক না হয়েও বলতে পারি যে, ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান থেকে তিনি কোনো সময়েই পুরোপুরি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি, মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনটারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন; তবে একথা ঠিক যে তাঁর ব্যাপক চর্চার বিষয় সামান্য সংস্কৃতির প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ দ্রাবিত হয়েছিল।

দুই : সংস্কৃতিজিজ্ঞাসা

ইংরেজি "কালচার" শব্দের অর্থে বাঙলায় "সংস্কৃতি" শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভবত সুনীতিকুমারই শুরু

করেন এবং ওই বিশেষ অর্থে নিঃসন্দেহে তিনিই শব্দটির সর্বাগ্রগণ্য প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্র "কালচার" অর্থে "অনুশীলন" শব্দটি ব্যবহার করতেন; "অনুশীলনে"র পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন "কৃষ্টি" শব্দটি। কিন্তু "কৃষ্টি" শব্দটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অস্বস্তি ছিল, কারণ "কৃষ্টি" শব্দটিতে কর্ষণের ভাব যতটা আছে কল্পনার ভাব ততটা নেই। যদিও পরম্পরাগত ধর্মগত সমাজগত বংশগত আচার-বিচার নিষেধ-নির্দেশ অর্থে "সংস্কার" শব্দটি বহুকাল ধরেই বাঙলায় বহুল প্রচলিত, তবু ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত "সংস্কৃতি" শব্দটি তার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি নিয়ে বাঙলা ভাষাতে আবির্ভূত হয় নি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অর্থে "যজমানে"র জীবনকে ছন্দে বর্ণে রূপে সমুন্নত, সম্পাদিত করার বিধেয় রূপে "সংস্কৃতি" শব্দটিকে ব্যাপক প্রয়োগে লোকপ্রিয় করে তোলেন সুনীতিকুমার এবং এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায় ও সমর্থক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

আধুনিক অর্থে সংস্কৃতির বিচিত্র তাৎপর্য সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের প্রথম রোমাঞ্চময় উপলব্ধি হয় ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত আর শ্যামদেশ ভ্রমণের কালে। এই ভ্রমণের সময় সুনীতিকুমার আবিষ্কার করেন বিশ্বচেতনার আধার রবীন্দ্রনাথকে আর রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন রসস্রষ্টা সুনীতিকুমারকে। এই ভ্রমণের কালে রবীন্দ্রনাথ "জাভাযাত্রীর পত্রে" লেখেন, 'আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। ...কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত একথা বলা চলে যে, শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেচে, শব্দচিত্র তাদের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি—এই বড়ো অপূর্ব।'

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি থেকে তিনটি পৃথক কিন্তু পরস্পরসম্পৃক্ত প্রসঙ্গ পাওয়া গেল। প্রথমত, সুনীতিকুমারের পণ্ডিত-রূপে পরিচয়; দ্বিতীয়ত, বিশ্ব-ব্যাপারে সুনীতিকুমারের সজীব আগ্রহ; এবং তৃতীয়ত, সুনীতিকুমারের বিশ্বরূপী চিত্রস্রোতকে কাগজে-কলমে ধরে রাখার স্বাভাবিক ক্ষমতা। এজন্যে সুনীতিকুমারের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রভূত প্রত্যাশা ছিল—ভাষা নিয়ে সুনীতিকুমার মহৎ কাজ তো করবেনই, তার সঙ্গে পণ্ডিতের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু কাজও করবেন। ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে এক পত্রে সুনীতিকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'তোমার কাছে আরো অনেক কিছু প্রত্যাশা করবার আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল চাপে তোমার মানসক্ষেত্রের অনেক বীজ হয়তো অঙ্কুরিত হতে বাধা পাবে—তার মধ্যে উপন্যাসরচনা একটা। তবু যদি উপন্যাস লেখো তাহলে শুদ্ধির জাদুজালজড়িত কোনো একটা কৃত্রিম বিবাহের ট্র্যাজেডি তার বিষয় হতে পারে।' সহজবোধ্য কারণেই 'নিছক পণ্ডিত' রূপেই সুনীতিকুমারের বিশেষ প্রসিদ্ধি, কিন্তু তাঁর সেই পরিচয়ের পরিধি অতিক্রম করে অন্যতর পরিচয় অধিগত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল বলে তিন মাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে।

সুনীতিকুমারের মধ্যে ঔপন্যাসিকের সম্ভাবনা আবিষ্কার কি একেবারে কবির কল্পনা ছিল? একজন ঔপন্যাসিক একটা পরিবেশ রচনা করেন, তারপর সেই পরিবেশে চরিত্রে-চরিত্রে সম্পর্কবিকাশের বৃত্তান্ত সম্তর্পণে প্রণয়ন করেন, ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে অনুসরণ করেন বিশ্বস্তরূপে। ঔপন্যাসিকের এই কাজের সঙ্গে সুনীতিকুমারের প্রধান-প্রধান

কাজগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শুনেছি আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের কাজ দর্শনমূলক। সুনীতিকুমারের কাজ কিন্তু কাহিনীমূলক। *The Origin and Development of Bengali Language*-ও কাহিনীমূলক আর "রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ"-ও তা-ই। সুনীতিকুমারের অধিকাংশ রচনাতেই দেখি জাতিতে-জাতিতে সম্পর্কবিকাশের বৃত্তান্ত এবং সেই সম্পর্কের প্রকৃতি আর বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ। "রবীন্দ্রসংগমে" ভ্রমণকাহিনীও প্রকৃতপক্ষে ভারত ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশের সম্পর্কের কাহিনী এবং সেই সঙ্গে উক্ত-সম্পর্কজাত সংস্কৃতির বিশদ বিবরণ। এই সংস্কৃতি যেন দুই জনগোষ্ঠী বা পরিবারের মধ্যে রচিত সম্পর্কের ফলে স্বাভাবিক পরিণামরূপী সন্তান-সন্ততি।

এই ভ্রমণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সুদূর অতীতে আংশিক একটি অসমাপ্ত কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি অন্বেষণের আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই অনুভব অবিস্মরণীয় রূপ পেয়েছে 'সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে বসিয়াছিলে উপল উপকূলে' কবিতাটিতে—কবিতাটির অবলম্বন হল সাগরপরিবৃত বলিদ্বীপের সঙ্গে ভারত ভূখণ্ডের বহুকালব্যাপী বিচিত্র আর মধুর সম্পর্কের কাহিনী যার উপসংহারে আছে কবিরূপে ভারত ভূখণ্ডের বলিদ্বীপে পুনরাগমনের ঘটনা। "রবীন্দ্রসংগমে" গ্রন্থটির পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধার করে সুনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন যে শেষ স্তবকে 'মহাযোগী' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের ও সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। সুনীতিকুমারকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বুদ্ধ-ও যে মহাযোগী। বলিদ্বীপে দেখলে না, 'পদণ্ড শিব'-এর পাশে 'পদণ্ড বুদ্ধ'-ও আছেন—শিব আর বুদ্ধ ওদেশে যে এক হয়ে গিয়েছেন।'

মানুষে-মানুষে সাক্ষাৎ-রোমাঞ্চ-মিলন-বিরহ-বিবাদ-পুনর্মিলনের কাহিনীর মতোই জাতিতে-জাতিতে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সংযোগের আর সম্পর্কের কাহিনীও বিচিত্রগতিতে প্রবাহিত হয়, উর্বর ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্ম দেয়, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার অমোঘ বৈশিষ্ট্য সমন্বয় সাধন—এইসব বোধ অবশ্যই সুনীতিকুমারের স্বভাবগত ছিল, কিন্তু মনে হয় তিনমাসব্যাপী রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সুনীতিকুমারের মানসে এইসব বোধকে অধিকতর যথার্থ আর সম্পন্ন করেছিল।

তিন : বাঙলার সংস্কৃতি

সুনীতিকুমার প্রথমত বাঙালি, এবং বাঙলা ভাষার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিয়েই তাঁর প্রথম গবেষণা। যে-বছর তাঁর *The Origin and Development of Bengali Language* গ্রন্থাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোয় সেই বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে "সবুজপত্র" পত্রিকার ১০ম বর্ষের ১ম সংখ্যাতে তিনি "বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতির গোড়ার কথা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম থেকেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু স্পষ্ট। পরের বছর তাঁর রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ ভ্রমণ। আবার ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যাতে লেখেন "বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্যশব্দ সংকলন" প্রবন্ধটি। ১৯৩৩ সালে "উদয়ন" নামক পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যাতে লেখেন "বৃহত্তর বঙ্গ" নামে একটি প্রবন্ধ আর "বঙ্গশ্রী" পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘ আর ফাল্গুন সংখ্যাতে লেখেন "বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধটি। বাঙলার সংস্কৃতি নিয়ে সুনীতিকুমার আরও অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু এখানে সেই-সমস্ত রচনার তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। বাঙলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের প্রধান রচনাগুলি বলতে আমি উল্লেখিত চারটি প্রবন্ধের কথাই বিশেষভাবে বুঝি। এই চারটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমটি একান্ত রূপেই ভাষা-বিষয়ক, শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটিতে তিনি বিশেষভাবে বাঙালি জাতির সংজ্ঞা আর পরিচয় এবং সেই সঙ্গে

বাঙালি সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও সীমানা এবং বিবরণ ও বিশিষ্টতা লিপিবদ্ধ করেছেন।

"বৃহত্তর বঙ্গ" প্রবন্ধটিতে বৃহত্তর বঙ্গ সম্বন্ধে সেকালে প্রচলিত ধারণাটির তাৎপর্য ও যথার্থতা বিচার করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশকে বৃহত্তর বঙ্গ বলে একটি ধারণা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে বাঙালিরা ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে প'ড়ে ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইংরেজি আইনের ব্যাখ্যাকার, ইংরেজ সরকার ও বাণিজ্যসংস্থাগুলির কর্মচারী—এক কথায়, ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশীয় প্রতিনিধি ও প্রচারক রূপে কাজ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহত্তর বঙ্গ ধারণাটির উদ্ভব হয়। একথা ঠিক যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যুগ থেকে বঙ্গবাসী সংস্কৃতির চর্চায় নিজস্ব গৌরব রচনা করেছিল; একথাও ঠিক যে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে ধীমান ও বীতপাল, দর্শন ও ধর্মচর্চায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ীরীতির গৌরব প্রণয়নে জয়দেব এবং চন্দ্রগোমী, ভট্ট ভবদেব, বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ প্রমুখ জ্যোতিষ্ক-পুরুষদের আবির্ভাব হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতেই; কিন্তু সত্য এই যে এসব ঘটনা সত্ত্বেও গৌড়-বঙ্গবাসীর বিশেষ চেতনা বা স্বতন্ত্র সত্তার জন্ম প্রাচীন কালে হয় নি। অবশ্যই বঙ্গসন্তানরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে সমুদ্রযাত্রায়, ব্যবসায়বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণে উৎসাহ, দুঃসাহসিকতা আর দূরদর্শিতা দেখিয়েছিল, কিন্তু তাদের পরিবাহিত সংস্কৃতি ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ বা দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি রূপেই গণ্য হয়েছিল। ১২০০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কি-পারসিক-মোগল প্রভাবের যুগ, সাধারণ বঙ্গবাসীর কূর্মবৃত্তি অবলম্বনের যুগ; এই যুগের আন্তর্ভারতিক ভাবজগতে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বই বাঙলার একমাত্র অবদান—এ ছাড়া না সংস্কৃত ঐতিহ্যে, না পারসিক সংস্কৃতিতে কোথায়ও বাঙলার কোনো গৌরবজনক ভূমিকা নেই; আর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তো কোনো ভূমিকাই নেই। প্রকৃতপক্ষে এক অতিশয় লজ্জাজনক ঘটনাকে সোপান করে ইংরেজদের প্রতি-নিধিরূপে বাঙালি জাতি ভারতের ইতিহাসে অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করে। ওই অধিকারের ভিত্তিতেই বৃহত্তর বঙ্গের ধারণা গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর বঙ্গ ধারণাটির পেছনে যে আত্মশ্লাঘাবোধ, যে সাম্রাজ্য-অভিমান বিদ্যমান তা অর্বাচীন কালের একটা সাময়িক উপলব্ধি মাত্র—তার কোনো ঐতিহাসিক ঔচিত্য নেই, সামাজিক সংস্কার নেই, তা একটা অর্থহীন অহমিকা।

কিন্তু সত্যই কি বাঙালির সবই অর্থহীন অহমিকা? এরই উত্তর দিয়েছেন "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি পরে "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধরূপে এবং পরে "ভারত সংস্কৃতি" গ্রন্থে সংকলিত হয়। সুনীতিকুমার এই প্রবন্ধটি লিখে-ছিলেন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার বাঙালি জাতি, বাঙালি সংস্কৃতি আর বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এখন-কার বাঙালি জাতি, সংস্কৃতি আর সাহিত্যের মধ্যে সমদৃশতা একান্তই দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু অধুনা দু দেশে বিভক্ত বাঙালির ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অধিকার মোটামুটিভাবে সমানই আছে। তাই দু দেশের দ্বিখণ্ড বাঙালির ঐতিহ্য, পরি-প্রেক্ষিত ও প্রবাহক্রম অনুধাবনে এই প্রবন্ধটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'পাল-যুগে নূতন সৃষ্ট বাঙালী জাতির মনের সুর তাহার আর্য-ভাষার তারকে অবলম্বন করিয়া উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যেভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে মোটের উপর সে সুরটি এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই একই সুরে নানান ঝঙ্কার শুনা গিয়াছে; কখনও বৌদ্ধ, কখনও ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনও বৈদিক (বৈদিকের ঝঙ্কার বাঙ্গালাদেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণভাবে শুনা গিয়াছে), কখনও শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব;

এবং কখনও মুসলমান সুফী।' মুসলমান আক্রমণ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের বক্তব্য আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। এই বিষয়ে লিখেছেন, 'প্রথম সংঘাতের পরে বাংলায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে একটা সংস্কৃতি-বিষয়ক সহ-যোগিতা আরম্ভ হইল। মুসলমান সুফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তরভারত হইতে এবং ক্বচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের অনেককে বলপূর্বক মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে যে মতের মোহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তী মত অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাংলাদেশে ইসলামের সুফী মতই বেশি প্রসার লাভ করে। সুফী মতের ইসলাম সহজেই বাংলায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুর্কী বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাংলায় আসিয়াছিল তাহা নিজেকে বাঙালির পক্ষে সহজ-গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজ্‌মু'অল-বহ্‌রেন্‌' অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'

জনপদের গড়ন বাঙলার জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কে আশ্রয় করেই জীবন বিকশিত হয়েছে। গ্রাম দিয়েছে দার্শনিক চিন্তা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগর দিয়েছে বাস্তব সভ্যতা—কর্মপ্রাণ সভ্যতা। আরবদের মধ্যে "মদীনা" বা নগরের জীবনযাত্রাই "তমদ্দুন" বা সভ্যতা। কিন্তু বাঙলার জীবনে নগরের ভূমিকা খুব নগণ্য। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেমন বড়ো-বড়ো নগর আছে বাঙলায় তেমন নেই। 'বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রামের জীবনেরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ ছিল।...বাংলাদেশ ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে একটু যেন বিচ্ছিন্নভাবেই বরাবর ছিল।' মুসলমান-বিজয়ের ফলেও অবস্থার উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন হয় নি। 'স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালদেশ ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মতো অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার তেমন কোন যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাংলার পক্ষে আংশিক ভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভবপর হইল। দিল্লী-আগরার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল—বাঙ্গালার বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর নগর স্থাপনকালে সাহায্য করিলেন (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ), বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তর-ভারতের ধর্মজীবনে অংশ-গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্য্যের মতকে উত্তর-ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন, দিল্লী, আগরা, জয়পুর, চিতোর হইতে পারস্য ও তুরস্ক পর্যন্ত সর্বত্র রাজ-দরবারে বাঙ্গালার ঢাকাই মলমলের চাহিদা বাড়িয়া গেল, বাঙ্গালার বাঁশে তৈয়ারী কুঁড়ে ঘরের বাকা ধাঁচা 'রেওটী' নামে রাজপুত-মোঙ্গল বাস্তু-শিল্পের মধ্যে স্থান পাইল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দুযুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথম কাটাইয়া, নিখিল ভারতীয় সভ্যতায় অংশ-গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোক-ভাষা (হিন্দী) হইতে বাঙ্গালাতে দুইখানি বই অনুদিত হইল—নাভাজী দাসের "ভক্ত-মাল" এবং মালিক মোহম্মদ জায়সীর "পদুমাবত"। দিল্লী, আগরা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যে

যোগ নূতন করিয়া মোগল-বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ হইল সে যোগ আর বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড় স্থান দিতে হয়।'

অতঃপর এই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ইসলাম বাঙলার জনসমষ্টিতে যেরকম উল্লেখযোগ্য রূপ ধারণ করেছে বাঙলার সংস্কৃতিতে তেমন করে নি: 'যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতিনীতি ও চিন্তাপ্রণালী) বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই। সুফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালী (অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু) মনোভাবের একটা আপস হইয়াছিল, সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত) বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল।' সুনীতিকুমারের বক্তব্য অনুসারে, এই প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, বাঙালি জনসমষ্টির অর্ধেকের উপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেও, বঙ্গ-বহির্ভূত তথা ভারত-বহির্ভূত আরব ইরাক ইরান সিরিয়া প্রভৃতি দেশগুলির গৌরবগাথা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বাঙালি মুসলমান জনসাধারণ মাত্র সাম্প্রাতক কালে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে, ইংরেজি-শিক্ষিত তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পরিশীলিত মুসলমানদের উদ্যোগে প্রধানত ইংরেজিতে লিখিত মুসলমান সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে ধারণা ও প্রেরণা অর্জনে সচেষ্ট হয়েছে। এর ফলে বাঙালি মুসলমানের মনে একটা অস্বস্তির ভাব এসেছে। আবার মনে করিয়ে দিতে চাই, এই প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

অস্বস্তির কারণটাও সুনীতিকুমার ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মবিশ্বাস অন্তরাশ্রয়ী বিষয় বটে, কিন্তু সংস্কৃতির অনেকটাই বহিরাশ্রয়ী বিষয়। এই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার আরও বলেছেন, 'বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু, এ তাবৎ তাহা বাঙ্গালীর জীবন ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াই আসিয়াছে। এখন কোনও কোনও দিক হইতে যে নবীন প্রয়াস হইতেছে, তদ্দ্বারা ভাঙ্গন ঘটিবে।' সুনীতিকুমারের যুক্তিধারা অনুসরণ করে আমরা যোগ করতে পারি যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সাধনা করতে-করতে বাঙলার সংস্কৃতি আজ যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে পেছনে ফিরে হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম বা যে কোনো ধর্মের শুদ্ধ রূপের বা মোল উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে 'একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।'

অতঃপর সুনীতিকুমার বাঙলার বস্তুগত সংস্কৃতি অর্থাৎ বাস্তুশিল্প, চিত্রশিল্প, বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প, কৃষিকর্ম এবং কৃষিপ্রধান জীবনধারা অবলম্বনে বিকশিত বাঙলার অনুষ্ঠান-আচার-উৎসব-পালপার্বণ-মূলক সংস্কৃতি, রন্ধনশিল্প ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুগত সংস্কৃতি বিশেষভাবে একটা ভৌগোলিক অভিব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতি এবং পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আবার ওই প্রকৃতি আর পরিবেশ এবং বস্তুগত সংস্কৃতি জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিকতা আর মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। কালক্রমে অঞ্চলের প্রকৃতি, সংস্কৃতি আর মানসিকতা অঞ্চলবাসীদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলে। সুনীতিকুমার জনগোষ্ঠীর বিষয়ে এই সবগুলি প্রসঙ্গকেই এই একটি প্রবন্ধের আধারে ধারণের চেষ্টা করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির লক্ষণীয় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে আর বাঙলার সংস্কৃতি-গতি-প্রকৃতির দিগ্‌দর্শনে—এক কথায়, সামগ্রিকভাবে বাঙলার সংস্কৃতি বিষয়ে এবং বাঙালির লক্ষণীয় পরিচয় নির্ণয়ে বিশদ আলোচনার ও বিস্তৃত গবেষণার জন্যে

সূত্রাবলী নির্দেশ সুনীতিকুমারের এই প্রবন্ধটি রচনার প্রায় ৬০ বছর পরেও এবং ইতিমধ্যে বাঙলার একাংশ প্রথমে মূল ভূখণ্ডের থেকে ও পরে ভগ্নাংশের থেকে ভাগ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দুই বাঙলারই বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

চার : ভারতের সংস্কৃতি

সদ্য-আলোচিত "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" প্রবন্ধটির প্রথমাংশে সুনীতিকুমার বলেছেন, 'বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ।' শুধু বাঙলা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা-গুলিকে আশ্রয় করে বিকশিত বিভিন্ন প্রান্তিক জনগণ এবং প্রান্তিক সংস্কৃতিগুলির পরিচয় অন্বেষণেও সুনীতিকুমারের অবদান অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তাঁর প্রধান গবেষণাপত্র, যা সংক্ষেপে ODBL নামে বিখ্যাত, রচনার অব্যবহিত পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে "বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় *Our Early Brothers, the Kol People* এবং "মডর্ন রিভিয়ু" পত্রিকার ডিসেমবর সংখ্যায় *Dravidian Origins and the Beginnings of Indian* নামে দুটি প্রবন্ধ, এবং আবার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে "দ্রাবিড়" নামে ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে "কোল-জাতির সংস্কৃতি" নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। বাঙলা প্রবন্ধ দুটি স্পষ্টতই বাঙালি জন-সাধারণকে বাঙালির দ্রাবিড় ও কোল উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত করে তোলার প্রয়াস। এই প্রবন্ধগুলিতে সুনীতিকুমার সাধারণভাবে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রাথমিক উপাদানগুলির মধ্যে দুটি বিশিষ্ট উপাদানের ভূমিকা নিরূপণ ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। "দ্রাবিড়" প্রবন্ধটিতে যা কুক্ষিকারূপে ছিল তাকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি বক্তৃতায় সংশোধিত ও সংযোজিত রূপ দেন; এই তিনটি বক্তৃতা দু বছর পরে *Dravidian* নামে বইয়ের আকারে প্রকাশ করে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। এই ছোটো বইটিতে দ্রাবিড় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের জন্ম আর বৃদ্ধির বৃত্তান্ত, ভারতীয় নগরসভ্যতার উৎস-সন্ধান এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সভ্যতায় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর অবদানের মূল্যায়ন সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে।

কিন্তু সুনীতিকুমারের পথিকৃতের সম্মান প্রাপ্য ভারতীয়-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অবদানের মূল্যায়নে। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান হল মঙ্গোলীয় উপাদান—এই উপাদানটির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রমাণে সুনীতিকুমারের প্রথম প্রয়াস-গুলির মধ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "অহম-রাজ স্বর্গ-দেব রুদ্রসিংহ" ও "বড়ো জাতি" প্রবন্ধ দুটি এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "মণিপুর-পুরাণ" প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আসামের জোড়হাটে প্রদত্ত প্রতিভাদেবী বক্তৃতা-মালার ভিত্তিতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল পত্রিকার ১৬শ খণ্ডের ২য় সংখ্যাতে প্রথম প্রকাশিত *Kirata Jana-Kriti—the Indo-Mongoloids : Their Contribution to the History and Culture of India* রচনাটিকে অদ্যাবধি আলোচ্য বিষয়ে প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে প্রধানতম রচনা বললে ভুল হবে না। ৩য় পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন এইভাবে : The Unity in Diversity that *is so characteristic of Indian civilisation presents as its own consequence a* Harmony of Contrasts ৪র্থ পরিচ্ছেদে বলেছেন যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তি সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃতীয় সংস্কৃতি। অতঃপর এই ভারতীয় সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের পর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সম্প্রসারণের গতিবিধি অনুসরণ, তাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ এবং ভারতীয়-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবির্ভাব, বৈদিক সাহিত্যে ও

আর্যভাষার বিভিন্ন পুরাণে ভারতীয়-মঙ্গোলীয়দের অবস্থা ও ভূমিকা, ক্রমে-ক্রমে তাদের অহম, বড়ো, গারো, মণিপুরী, তিপরা, কাছারি, কোচ প্রভৃতি শাখায় বিভাজন, বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস-নির্বাচন ও আপন-আপন পুরাণ ও বুরঞ্জি প্রণয়ন, হিন্দু তথা আর্যভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির সহযোগিতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি, ভারতীয়-মঙ্গোলীয় চরিত্রের বিশিষ্টতাগুলি নির্ণয়করণ, মঙ্গোলীয় ইতিহাস ও হিন্দু ইতিহাসের সংযোগসূত্রগুলির সূচি-প্রণয়ন, সংস্কৃত ভাষাগোষ্ঠীর উপর মঙ্গোলীয় ভাষা-গোষ্ঠীর প্রভাব, মঙ্গোলীয় ধর্মচিন্তা আর হিন্দু ধর্ম-চিন্তার মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বিবরণ, ভারতীয়-মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির সংযোগ, ভারতীয়-মঙ্গোলীয় যে এক মিশ্র সংস্কৃতি, তার প্রমাণ ও লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ—এইরকম ৯৮টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে সুনীতিকুমার আলোচনাটিকে প্রথম প্রকাশ করেন; পরে আরও ৩টি পরিচ্ছেদ যোগ করে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। উপসংহারের শেষে যোগ করেন ভারতীয়-মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের তালিকা।

এই গ্রন্থের উপসংহারে সুনীতিকুমার লেখেন যে কিরাত বা ভারতীয়-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী ভারতীয় ইতিহাসের মূল চারটি উপাদানের অন্যতম হলেও ভারতীয় জীবনে আর মননে এই জনগোষ্ঠীর অবদানের সম্যক স্বীকার ও বিচার হয় নি। অথচ মহাভারতে পাণ্ডবদের জন্মকাহিনীগুলির সঙ্গে কিরাত সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার অবকাশ বিদ্যমান। অহিংসা, করুণা আর মৈত্রীর যে-আদর্শকে আজ বিশ্বের সকাশে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান বলা হচ্ছে, তার উদ্গাতা বুদ্ধদেব সম্ভবত ভারতীয়-মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসরচনার কালে লিচ্ছবি, নেওয়ার, কাছারি, কোচ, তিপরা, মণিপুরী, বড়ো প্রভৃতিদের বৈশিষ্ট্য আর সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করা হয় না। অথচ ভারতীয়-মঙ্গোলীয়রা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে, ভারতীয় জনজীবনে অবশ্য স্বীকার্য অর্থ আর মাত্রা এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক অনুধাবনায় আর দেবদেবীর কল্পনায় নতুন বিশিষ্টতা যোগ করেছে।

"কিরাত জন-কৃতি"তে ভারতীয়-মঙ্গোলীয় উপা-দানের পরিচয় অন্বেষণ ও নিষ্পাদনের যে-পথ সুনীতি-কুমার প্রদর্শন করেন, সেই পথে নিজেই আরও অগ্রসর হন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত *The Place of Assam in the History and Civilisation of India* নামক বাণীকান্ত কাকতি বক্তৃতামালায় এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইমফলে প্রদত্ত *Religious and Cultural Integration of India : Atambapu Sarma of Manipur* নামক পণ্ডিতরাজ অটোমবাপু শর্মা বক্তৃতামালায়। এই দুটি বক্তৃতামালায় "কিরাত জন-কৃতি"তে প্রস্তাবিত প্রসঙ্গগুলির থেকে দুটি প্রসঙ্গকে আরও গভীরভাবে এবং বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছেন। এ ছাড়াও, এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শ খণ্ডের ২য় সংখ্যাতে *The Name Assam-Ahom*, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ইনডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের স্মারকগ্রন্থে *Assam and India* প্রভৃতি প্রবন্ধে এই একই প্রসঙ্গের অধিকতর অনুসন্ধানে সুনীতি-কুমারকে অক্লান্ত দেখি। সমন্বিত ও সংহত ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়-মঙ্গোলীয় উপাদানের বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নে তাঁর একক কীর্তি আজও অনতিক্রম্য।

অঞ্চলবিশেষের অধিবাসীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ ও প্রদানের এই উপবিদ্যার ধারা অনু-সারেই ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরে *The People, Language and Culture of Orissa* নামক আর্তবল্লভ মহান্তি বক্তৃতামালা প্রদান করেন। এর ফলে ঘটনা যা দাঁড়াল তাতে নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে ষাটের দশকের মধ্যে সুনীতিকুমার আসাম থেকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাঙলা অধিগত করে ওড়িশা পর্যন্ত

যে ভৌগোলিক অভিব্যক্তি বিস্তৃত, তার সমগ্র মিশ্র বহুজাতিক জনসমষ্টির ইতিহাস, ভাষা আর সাহিত্য এবং সাধারণ সংস্কৃতি চর্চার প্রশস্ততম এবং সমৃদ্ধতম ভিত্তি রচনা করেন।

তবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে ব্যাপক-প্রভাবসম্পন্ন উপাদান আর্যভাষী জনগোষ্ঠী এবং এই জনগোষ্ঠীর প্রভাববিস্তারে সাফল্যের প্রধান কারণ এদের ভাষা। আধুনিক সমস্ত ভারতীয় ভাষার উপরে সংস্কৃত ভাষার কম-বেশি প্রভাব দেখা যায়। বিশাল ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন ও বিষম অঞ্চলগুলির মধ্যে, বিবিধ ও বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে, পৃথক-পৃথক পরিবেশ-আশ্রিত সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান ঐক্যকারক, সংহতিসম্পাদক ও সামঞ্জস্যসাধক শক্তিরূপে সংস্কৃত ভাষার চরিত্র ও ভূমিকা প্রশ্নাতীত। এই সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে বহু পুরুষের সাধনায় সংস্কৃতির যে-সৌধ ভারতভূখণ্ডে নির্মিত হয়, তাকে সুনীতিকুমার সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন।

সুনীতিকুমার ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে "হিন্দু সভ্যতার পত্তন", "এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব", "দ্রাবিড়", "হিন্দু ধর্মের স্বরূপ", "হিন্দু আদর্শ ও বিশ্ব-মানব", "ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত", "ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার", "হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে?"—এই আটটি প্রবন্ধ নিয়ে "ভারত সংস্কৃতি" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে "দ্রাবিড়" প্রবন্ধটির উল্লেখ আগেই করেছি। বাকি সাতটির মধ্যে "ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার" রচনাটি একটু প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়—প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯-৪০ সালে সপ্তাহ তিনেকের জন্যে বর্মা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটি আধা-ভ্রমণমূলক রচনা। কেন এটিকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তার কারণ অনুমান করতে পারি প্রবন্ধটির একাংশ থেকে: 'বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর দিয়া ভারতের মনের প্রভাব বর্মায় পহুঁছিয়া, বর্মী জীবনের অনেক আদিম বর্বরতাকে এইভাবে অবলুপ্ত বা সংস্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রহ্ম-দেশের জীবনের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, গভীর ও অন্তর্মুখী, সুকুমার ও উচ্চ ভাবের পরি-পোষক তাহার কেন্দ্র হইতেছে দেশের নগর ও গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শত শত বৌদ্ধ kyaung চ্যঙ বা বিহার।' গত পঞ্চাশ বছরে বর্মার ইতিহাসের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, বর্মার জীবনে অনেক ভাঙচুর হয়েছে, কিন্তু বিহারগুলি আজও বর্মার এক জীবন্ত প্রতিষ্ঠান এবং এই বিহারগুলির সূত্র ধরে ভারতীয় মন আজও বর্মার জীবনে সক্রিয়। সেজন্যেই "ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার" প্রসঙ্গটি "ভারতসংস্কৃতি"র অন্তর্গত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যখন "ভারত সংস্কৃতি"র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন সুনীতিকুমার এর সঙ্গে যোগ করেন "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" গ্রন্থের ছটি প্রবন্ধ। সংযোজিত ছটি প্রবন্ধের বিষয় বিশেষ-ভাবে বাঙলার সংস্কৃতি, অন্য দুটি প্রবন্ধ হল "কাশী" এবং "পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি।"

"পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি" প্রবন্ধের এক জায়গায় সুনীতিকুমার বলেছেন, 'এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই:—ভারতের পুরাণের ধারা, আর্য ও অনার্য উভয় জাতির দেবতাবাদ ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান; পুরাণের মূল উৎস, আংশিক ভাবে বেদেরও পূর্বেকার যুগে ভারতে প্রচলিত দেব-কাহিনী ও রাজ-কাহিনী। আর্য এবং অনার্যের মিশ্রণের ফলে হিন্দু-জাতির উদ্ভব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, অনার্য পুরাণও আর্য ভাষায় গ্রথিত হইতে থাকে—কোথায় সংস্কৃতে, কোথাও প্রাকৃতে; এবং অবশেষে, গুপ্তবংশীয় সম্রাট-দের রাজ্যকালে ব্যাসদেবের নামের সঙ্গে পুরাণ কাহিনীগুলিতে জড়িত করিয়া রামায়ণ-মহাভারতের পাশে পুরাণগুলির শেষ সংস্কৃত রূপ হিন্দুজনমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' ভারতের গণচিত্ত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে, কিন্তু এই সাহিত্যের অনেকখানি অনার্য, প্রাগ্‌বৈদিক, সংস্কৃত ভাষার আগমনের পূর্বের যুগ থেকে পাওয়া সম্পদ। সুনীতিকুমার বলেছেন,

'ঐতিহাসিক বিচারের দিক হইতে এগুলির গভীর-ভাবে আলোচনা হয় নাই।' এই মন্তব্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে সুনীতিকুমারের বক্তব্য—পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিচার হওয়া উচিত। আমরা পরে দেখব যে ভারতের গণচিত্তপ্রকাশক সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচারে সুনীতিকুমার নিজেই উদ্যোগী হন। ইতিহাস আর বিশ্বাস দুটি পৃথক ভাবসত্ত্ব—ইতিহাস সর্বদাই সত্য-আশ্রিত, সর্বথাই সত্য-সন্ধানী অর্থাৎ সত্যই ইতিহাসের একমাত্র সাধ্যবস্তু। কিন্তু বিশ্বাস হল সত্য-নিরপেক্ষ একটা মানসিক অবস্থা এবং কখনো-কখনো সত্যের বিরোধী। ইতিহাস ও বিশ্বাসের প্রশ্নে কোন্ পক্ষে সুনীতিকুমার যোগ দেবেন? এর উত্তরটা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল বলে "হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে?" প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার উদ্ধৃতি দিয়েছেন স্যার আবদুল কাদিরের রচনা থেকে: 'কোরানে এই মর্মে একটি কথা আছে যে ঈশ্বর মানব-জাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করিতে পারিতেন যে তাহা-দের একটিমাত্র ধর্ম হইত; কিন্তু তিনি মানুষকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, মানুষ নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি কিরূপে ব্যবহার করে ইহা দেখিতে চাহিলেন। মনে হয়, মানবের চিন্তাধারার বিভিন্নতা সৃষ্টি-পরিকল্পনার অন্তর্গত; এবং অন্যান্য বিষয়ে এই প্রকার বিভিন্নতা প্রকৃতির কার্যের অনুরূপ।'

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও "বিশ্বভারতী" পত্রিকার ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যাতে প্রকাশিত "দরাপ খাঁ গাজী" এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও "বিশ্বভারতী" পত্রিকার ১৩৬১ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ সংখ্যাতে প্রকাশিত "অল-বীরূনী ও সংস্কৃত" প্রবন্ধ দুটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—পরে দুটি প্রবন্ধই "সাংস্কৃতিকী" নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধেই সুনীতিকুমার হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়কাহিনীর অন্তর্গত দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। দরাপ খাঁ-র নামের শেষে গাজী শব্দটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ধর্মের নামে বিধর্মীদের অর্থাৎ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আবার এই দরাপ খাঁ-ই সংস্কৃতে আটটি শ্লোকে গঙ্গাস্তব রচনা করেছিলেন এবং স্বয়ং সুনীতি-কুমারের পিতামহের মতো বহু নিষ্ঠাবান হিন্দু জেনে বা না-জেনে দরাপ খাঁ রচিত স্তব দিয়ে গঙ্গার পূজা করে থাকেন। ঘটনাটা কি কৌতূহলোদ্দীপক নয়? আরও কৌতূহলোদ্দীপক অল-বীরূনীর কাহিনী। গজনীর সুলতান মাহমুদ প্রতিবেশী খীরা রাজ্য জয় করে অল-বীরূনীকে জামিন রূপে গজনীতে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে মাহমুদের দরবারে শত্রুপক্ষের জামিনের কোনো সম্মানজনক আসন পাওয়ার কথা নয়। গজনী তখন সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার এক কেন্দ্র ছিল। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই অল-বীরূনী সংস্কৃত ভাষা আর জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করেন। সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন যে, অল-বীরূনীর রচনাতে যে-সমস্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আরবি লিপিতে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি ভারতীয় আর্য-ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে যে-মুদ্রাগুলি প্রচলন করেন সেগুলিতে দুটি ভাষার ব্যবহার অর্থাৎ আরবিতে ও সংস্কৃতে কলমার অনুবাদের ব্যবহার দেখে সুনীতিকুমার মন্তব্য করেছেন, 'ইহা-ই হইতেছে ইহার প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। অনুবাদের যথার্থতা নয়, এখানে লক্ষণীয় সংস্কৃত ভাষার প্রতি মাহমুদের মনো-ভঙ্গি।' সুনীতিকুমারের মন্তব্য: 'হিন্দুদের ভাষাকে রাজকীয় মুদ্রায় স্থান দিয়া ইহার প্রতি যে মর্যাদা দেখানো হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদের বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।' এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের আরও একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: 'সুলতান মাহমুদ একজন কৃতকর্মা শাসক ছিলেন। তিনি উদার-হৃদয় ও সত্যকার শূর-বীর ছিলেন এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের একজন উচ্চদরের উৎসাহদাতা ছিলেন।'

উপরের উল্লেখ ও উদ্ধৃতিগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে সুনীতিকুমার ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে অস্ট্রিক ও কোল-খাসি-ভাষী জনগোষ্ঠী, দ্রাবিড়-ভাষী জনগোষ্ঠী, ভারতীয়-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী ও আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বিত সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন। পরবর্তী কালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরব-ইরান থেকে আগত মুসলমান সংস্কৃতি এবং এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা—শুরু হয় নতুন ধরনের সমন্বয়প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার পরীক্ষা। এতদিন সুনীতিকুমার বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাবলীর আকারে ভারতীয় সমন্বয় এবং ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মিশ্রণ সম্বন্ধে যেসব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তাকে সংহত করে একটি প্রবন্ধের আকারে উপস্থাপন করলেন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইনডিয়া ওরিয়েনটাল কনফারেনসের ১৮শ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে। সেই ভাষণকে সংযোজিত ও সংশোধিত রূপ দিলেন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে *Indianism and The Indian Synthesis* নামে বিখ্যাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় কমলা বক্তৃতামালায়, যা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

২০৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত *Indianism and the Indin Synthesis* বইটির বিশদ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, শুধু খুব সংক্ষেপে বইটির পরিকল্পনা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দেওয়া যায়।

বইটির প্রথম ভাগে ভারত বলতে সুনীতিকুমার যে-ভূগোল, যে-ইতিহাস ও যে-সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন শুরুতেই তার পরিচয় দিয়েছেন। ভারত, ইনডিয়া, হিন্দ, হিন্দুস্তান প্রভৃতি শব্দের আধারে যে দেশ, যে ঐতিহ্য, যেসব অনুষ্ঠান ও মানসিকতা বিধৃত হয়েছে তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিদ্যাচর্চা শুরু হয় দশম শতাব্দীতে এশীয় ও ইউরোপীয় জগতের মধ্যে সবচেয়ে পণ্ডিত ও বিশ্বস্কর বিদ্বান অল-বীরূনীর অনুশীলনে আর অনুসন্ধানে। এই বিদ্যাচর্চার ধারাকে বহু প্রশ্নোত্তরে সমৃদ্ধ করে তোলেন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যেসব প্রাচ্যবিদগণ তাঁদের কীর্তি-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সুনীতিকুমার অগ্রসর হয়েছেন ভারতীয়তার মূল চরিত্র অনুধাবনে। বহুকাল ধরে বহু পুরুষ ধরে সময়সাধনের জন্যে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এই ভারতীয় চরিত্র তার নিজস্ব ও বিশিষ্ট রূপ বা ভারতীয়ত্ব লাভ করেছে। যাতে সম্যক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়তা উপলব্ধ হয় তাই তিনি গ্রীস, চীন, আরব, আফ্রিকা প্রভৃতি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ভারতীয়ত্ব বলতে একটা চিন্তাধারাকে বোঝায়, আবার একটা জীবনধারাকেও বোঝায়—পৃথক-পৃথকভাবে চিন্তাধারা ও জীবনধারার বিবরণ দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন যে হিন্দুত্ব আর ভারতীয়ত্ব সমার্থক নয় এবং সেজন্যে চতুর্থ অধ্যায়ের চ পরিচ্ছেদে হিন্দু ধারাতে প্রাচীন হিন্দু ইতিহাসের পুনর্গঠনের সঙ্গে ভারতীয়ত্বর সম্পর্ক নিয়ে স্বতন্ত্র পর্যালোচনা করেছেন। প্রথম ভাগের শেষে আলোচ্য বিষয়—ভারতীয়ত্বর প্রাণপ্রৈতি এবং সেই সঙ্গে মানবতার ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্বর ভূমিকা।

দ্বিতীয় ভাগের বিষয় হল ভারতীয় সমন্বয় ও ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আর সংস্কৃতির মিশ্রণ। এই বিষয়টিকে সুনীতিকুমার চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন: বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিলনের পরিণামে 'ভারতীয় মানুষে'র উদ্ভবের কাহিনী; বিভিন্ন অনার্য আর আর্য জনগোষ্ঠীর শোণিতের আত্তীকরণের কাহিনী; বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কাহিনী এবং বিভিন্ন অনার্য ও আর্য ধর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রণের কাহিনী। সবশেষে রোমান লিপিতে রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতাটি ও তার ইংরেজি অনুবাদ সন্নিবেশ করে বইটির মূল বক্তব্যকে কাব্যের আকারে উপস্থাপন করেছেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হয়

Languages and Literatures of Modern India নামে ১৯৫৬ সালে রচিত একটি প্রবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। বইটি দু খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভারত ও পাকিস্তানকে একটি একক রূপে গণ্য করে এই ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক ভাষাগুলি এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত ভাষাগুলির বিশিষ্টতা আর প্রচলিত ভাষাগুলির ব্যবহার থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির প্রকৃতি এবং সাধারণভাবে আধুনিক ভারতীয় জীবনে ওই সমস্যাগুলির গুরুত্ব আর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষার সঙ্গে লিপি সংক্রান্ত প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার লিপিগুলির পরিচয় এই বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আধুনিক ভারতে ভাষা-ও-লিপি-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বিপুলতা ও জটিলতা অনুধাবনে সুনীতিকুমারের অধিকার ও আন্তরিকতা, উদারতা ও উন্মুক্ততা সবিস্ময় শ্রদ্ধা জাগায়। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক ভারতের প্রধান চোদ্দটি ভাষার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন। বইয়ের শেষে দিয়েছেন আরও পাঠের জন্যে বিশদ গ্রন্থপঞ্জী। যদিও এই বই মূলত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক এবং ভাষার বিষয়কে বিশেষভাবে এই আলোচনার বাইরে রেখেছি, তবু বইটির উল্লেখ করলাম এজন্যে যে সাধারণভাবে এই বইয়ের ভাষা বিষয়ক অংশ বর্তমান ভারতের সমাজ-ও-সংস্কৃতি-সংক্রান্ত অনেকগুলি মৌল সমস্যার স্বরূপ অনুধাবনে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

পাঁচ : রামায়ণ-জিজ্ঞাসা

সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-বিষয়ক রচনাবলীর শুধুমাত্র নির্বাচিত অংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা ইতিমধ্যে যথেষ্ট দীর্ঘ আকার নিয়েছে। এর থেকে তাঁর কীর্তির বিপুলতা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হয়তো খানিকটা অনুমানসাধ্য হবে। তাঁর জ্ঞানচর্চা অনুসারে —ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশুদ্ধ উপাদান বলে কিছু নেই, সমস্তই মিশ্র, সমস্তই সঙ্কর এবং ভারতসংস্কৃতির সমৃদ্ধির মূলে আছে বহু জনগোষ্ঠীর থেকে সম্পদ আহরণের অভ্যাস ও আত্তীকরণের সাধনা। এমনকী যে রাম-কথা ভারতের সমস্ত প্রান্তেই নিজ-নিজ প্রান্তিক বিশিষ্টতা-সহ প্রাপ্তব্য, তা-ও বিমিশ্র জনগণের, বহুরূপান্তরসাধিত মানসিক অভিব্যক্তি। এক হিসেবে রামকথা ভারতীয় ঐক্যবিধানের অন্যতম প্রধান মঞ্চ। "রামায়ণ' প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের কৌতূহলের উল্লেখ না করে ভারতসংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ততম পরিচয়ও সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে "রামায়ণে"র প্রসঙ্গ তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন, বারবার উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবীর প্রধান পনেরোটি সাহিত্য-মণ্ডলের মধ্যে "রামায়ণ" এক অসাধারণ প্রভাব এবং নিঃসংশয় ছিলেন যে "রামায়ণ" ভারতীয় কল্পনা এবং সাধনার এক মহত্তম প্রকাশ। তবে "রামায়ণে"র সাংস্কৃতিক চরিত্র, উৎপত্তি, ইতিহাস, সম্প্রসারণ ও বিদেশ-বিস্তার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা ছিল এবং এই কৌতূহল আর জিজ্ঞাসাকে কখনো কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অধীন হতে দেন নি অথবা কোনো বিশুদ্ধ বিশ্বাসে বিবশ হতে দেন নি। বিশ্বাস তাঁর একটাই ছিল : 'গুহ্যম ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাচ্ ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।' (তোমাকে এই গুহ্য সত্য জানাই যে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৯৯/৩০ ; *Indianism* গ্রন্থে উদ্ধৃত।) মানুষ কেন অন্যান্য জীবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কারণ মানুষের মন আছে, চিন্তাশক্তি আছে, যা দিয়ে সে বিচার করে, সত্য খোঁজে, হিতাহিতের তুলনা করে। "রামায়ণ"-চর্চার প্রসঙ্গে সত্যের সন্ধান আর বিশ্বাস-পালনের মধ্যে বিরোধ এসে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

"রামায়ণ" প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার প্রথম দীর্ঘ আলোচনা করেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "কৃত্তিবাসী রামায়ণে"র ভূমিকাতে। তাতে একথাও উল্লেখ করেন যে শ্যামদেশে অর্থাৎ থাইল্যানডে ত্রয়োদশ শতকে আইয়ুথিয়া নামে

এক বিখ্যাত নগরী ছিল—দৈ বা থাই ভাষায় যা আইয়ুথিয়া, সংস্কৃত ভাষায় তা-ই অযোধ্যা। থাইল্যানডের বিখ্যাত নৃত্যনাট্য-শিল্পের নাম রাম-কিয়েন, ভারতের সংস্কৃত উচ্চারণে ওই রাম-কিয়েন শব্দটি রূপান্তরিত হবে রাম-কীর্তিতে। ওই প্রবন্ধেই সুনীতিকুমার বলেন যে শ্যামদেশীয় রাম-কথা, যবদ্বীপীয় রাম-কথা, ইন্দোনেশীয় রাম-কথা ইত্যাদি বিভিন্ন রাম-কথার তুলনামূলক আলোচনা 'অবলম্বন করিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।' অবশেষে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেমবর মাসে দিল্লীতে 'রামায়ণে'র উৎপত্তি, বিবর্তন ও মূল্যায়ন বিষয়ক পাঁচদিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে সুনীতিকুমার রামায়ণ-চর্চায় নতুন ইতিহাসের সূচনা, নতুন উৎসাহের সঞ্চার করেন। কিন্তু এর ফলে ভারতের রাম-ভক্ত-মণ্ডলীর একাংশ যে তাঁর উপর কতখানি ক্রুদ্ধ হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ *THE RAMAYANA : Its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus : A Resume* গ্রন্থের ভূমিকাতে পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থের জন্যে প্রাথমিক কাঠামো বা খশড়া যা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

"রামায়ণ" প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের প্রথম প্রশ্ন রাম-চরিত্রটির ঐতিহাসিকতা নিয়ে। বৌদ্ধ সাহিত্যে তথা পালিতে জাতক-কাহিনীতে এবং পাণিনির অষ্ট্যাধায়ীতে মহাভারতের বহু চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও রামের কোনো উল্লেখ নেই—এমনকী পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও রামের উল্লেখ নেই। অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য প্রমাণ করে যে ওই সাহিত্যের সমসময়ের মধ্যে "রামায়ণ" সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। রাম যদি প্রাচীন ঐতিহাসিক চরিত্রই হবেন তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব কালের সাহিত্যে তিনি অনুপস্থিত বা অপরিজ্ঞাত কেন? আরও উল্লেখ্য যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত "বুদ্ধচরিতে" অশ্বঘোষ বলেছেন যে কাব্য রচনায় চ্যবন ব্যর্থ হলেও বাল্মীকি সাফল্য লাভ করেন। মহাভারতেও ভার্গব মুনি চ্যবনের উল্লেখ আছে। তাহলে বাল্মীকি-রচিত কোন্ কাব্যের কথা অশ্বঘোষ উল্লেখ করেছেন?

পালিতে রচিত "দসরথজাতক" নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এই কাহিনীতে রাম একজন 'পণ্ডিত' রূপে চিত্রিত যিনি পিতার মৃত্যুতে পাণ্ডিত্যবশত অবিচল থাকেন ; এই কাহিনীতে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ আসলে তিন ভাইবোন যাঁরা প্রাসাদ-চক্রান্তের ফলে হিমালয়ে নির্বাসনে যান, পরে পিতৃরাজ্য গঙ্গাতীরে অবস্থিত বারাণসীতে ফিরে আসেন এবং রাম ভগিনী সীতাকে বিয়ে করেন। এই কাহিনীর সঙ্গে পৃথক-পৃথক ভাবে 'রামায়ণে'র কাহিনীর প্রথমাংশের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রামসীতার জন্মগত সম্পর্কটা কি স্বীকার্য? তা ছাড়া, শৌর্যসূচক-কাহিনীবর্জিত রাম-চরিত্র কি গ্রাহ্য? গঙ্গাতীরস্থ বারাণসী কি রামের পিতৃরাজ্য?

অতঃপর বানর-বাহিনী ও রাক্ষসদের সম্পর্ক বিষয়ক রহস্য। বানররা কি সত্যিই পশু, নাকি অধুনা অবলুপ্ত প্রাক্-দ্রাবিড় অস্ট্রোলয়েড বা নেগ্রোয়েড জনগোষ্ঠীর কেউ? তাহলে রাক্ষসরা কারা? তারা কি সেম জনগোষ্ঠীর আসিরীয় বংশ, নাকি প্রাক্-আর্য যুগের উন্নত নগরসভ্যতার নির্মাতা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর কোনো আত্মীয় বংশ? রাক্ষসদের সঙ্গে গ্রীক কাহিনীর একাধিক চরিত্রের সাদৃশ্য আছে, তবে রাবণের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে হোমার ও অল্পকাল পরের কবি হেসিয়োড-বর্ণিত ত্রায়ারেওসের। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের বিখ্যাত গ্রীক বক্তা ও লেখক ডিওন ক্রিসোসটোমের তথ্য অনুসারে হোমারের কবিতা ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ভারতবর্ষে পঠিত হত। তাহলে 'ইলিয়াডে'র সঙ্গে 'রামায়ণে'র যে-সাদৃশ্য তাকে কি প্রভাব বলা যায়?

এই বইয়ের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত

করেছেন সুনীতিকুমার : 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' বইয়ের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের থেকে এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমার একমত যে অযোধ্যায় নয়, বাল্মীকির মনোভূমিতেই রামের জন্ম হয়েছিল। বাল্মীকি-রচিত রাম একজন আদর্শ মানুষ, মহাবীর ও সুদর্শন, রামায়ণের প্রথম খণ্ডেই নারদের মুখ দিয়ে রামের সম্পর্কে বাল্মীকি বলেছেন, 'নর-চন্দ্রমা'। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে শূরোচিত কার্যাবলীর জন্যে রামের চরিত্রে কালক্রমে দিব্য গুণাবলী আরোপ করা হতে থাকে, রামের সঙ্গে আস্তে-আস্তে বিষ্ণুর এবং সীতার সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর সমীকরণ সম্পন্ন হতে থাকে।

মধ্যযুগে বিদেশাগত ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণের কালে নর-চন্দ্রমা রামচন্দ্র কেমন করে বিষ্ণু-অবতারে রূপান্তরিত হলেন সেই প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ সুনীতিকুমার লিপিবদ্ধ করেন নি একথা ঠিক, কিন্তু তিনি পরবর্তী কালের সত্যসন্ধানীদের জন্যে এই ছোটো বইটিতে বহুব্যাপ্ত ও সুগভীর অনুসন্ধানের প্রচুর সূত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে রেখে গেছেন। তবে তথ্য আর সত্যের অনুসন্ধানে এগোতে হলে যেসব ধর্মীয় আবরণে ও আভরণে রামায়ণ-কে সাজানো হয়েছে, সেসব সাজসজ্জা অপসারণ করতে হবে। ধর্মীয় মাহাত্ম্যের বেদীতে নিবদ্ধ রাম শুধুমাত্র এক দেশের এক সমাজের দেবতা, কিন্তু বাল্মীকির নরচন্দ্রমা বিশ্বের হৃদয়বিজয়ে নির্গত—দ্বীপময় ভারতের মুসলমান সমাজের, প্রত্র ভারতের বৌদ্ধ সমাজের এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সমাজের আগ্রহের বিষয়—সুনীতি-কুমার চেয়েছিলেন 'রামায়ণ' সম্বন্ধে আগ্রহকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করতে। রাম-কথা বিশ্ব-সংস্কৃতির ঐক্য সাধনের এক প্রধান কারণ হতে পারে কিনা তার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করা উচিত।

ছয় : বিশ্ব-সংস্কৃতি

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতিকুমার "সংস্কৃতি" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন, 'উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার কাছে নম্র পরমত-সহিষ্ণুতাকে আপাত-দৃষ্টিতে লাঘব স্বীকার করতে হয়েছিল সন্দেহ নেই ; কিন্তু ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মত সূফী মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণই হচ্ছে ভারতে ইসলামী আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মুখ্য কথা। নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি—যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয়, বিশুদ্ধ আরব-জাত ইসলামও নয়, যা হচ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু-ইসলামীয় সংস্কৃতি—এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে—নানা ধরনের খ্রীষ্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নোতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব-নব শিল্প-সৃষ্টি, Socialism বা সম্পত্তি-সাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে বহুরূপ হ'য়ে যা বিরাজ ক'রবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক'রে এক ক'রে তুলবে।'

বিশ্ব-সংস্কৃতি সুনীতিকুমারের এক বিশেষ উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিতে তিনি গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও ক্ষণজন্মা পুরুষদের সঙ্গী। এক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের অনন্যতা এই যে উপলব্ধিকে তিনি উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন, বস্তু এবং তথ্য দিয়ে তাৎপর্যকে করেছেন সমূর্ত।

বিশ্বসংস্কৃতির উপর সুনীতিকুমারের প্রধান-প্রধান রচনাকে দুটি ধারায় ভাগ করা যায়। একটি ধারাতে আছে বিশেষ একটি ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার অন্বেষণ ; অন্য ধারাটিতে আছে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলির প্রকৃতিনির্ণয় এবং শ্রেণীবিন্যাস।

প্রথম ধারার অন্তর্গত হল "ইউরোপ ১৯৩৮", *Africanism*, *Iranianism* প্রভৃতি রচনা। "ইউরোপ ১৯৩৮" বেলজিয়ামে ঘেনট শহরে ধ্বনি-বিজ্ঞানসম্মিলন, কোপেনহাগেনে আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক সম্মিলন ও ব্রাসেলসে প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের সম্মিলন উপলক্ষে ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী। *Africanism*-এ সুনীতিকুমার আফ্রিকার প্রতি শুধুই আমাদের আগ্রহী করেন নি, অবহিত এবং শ্রদ্ধান্বিতও করেছেন। বইটির শেষাংশ হল তাঁর নিজস্ব রীতিতে লেখা পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা, নাইজেরিয়া ও লাইবেরিয়া ভ্রমণের কাহিনী—তাঁর রীতি মানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে সেই দেশের আধ্যাত্মিক, মানসিক আর সাংস্কৃতিক সম্পদের সন্ধানে এক দুঃসাহসিক অভিযানের রীতি। আকারে ছোটো হলেও *Iranianism* গভীর গবেষণা- ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রচনা। ভারতীয়-ইরানীয় আধ্যাত্মিকতার উৎস- ও স্বরূপ-সন্ধান, জাতীয় মহাকাব্য রূপে শাহনামার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য, ইরানে ইসলামের হক বা সত্য ও নূর বা জ্যোতির সাধনা, ভারত ও পারস্যের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের তাৎপর্য বিশেষণ এবং বিশ্ব-সভ্যতায় ইরানের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে *Iranianism* এক অসাধারণ অনুসন্ধান।

বিশ্ব-সংস্কৃতি বিষয়ক অপর ধারাতে আছে *India and China*, *India and Ethiopia*, *Balts and Aryans* প্রভৃতি রচনা। প্রথম দুটিতে আছে ভারতের সঙ্গে চীনের ও ইথিয়োপীয়া বা অ্যাবিসিনিয়ার সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস বা বিবরণ। *India and China* এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকার ১৯৫৯ সালের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যাতে মুদ্রিত হয় বটে কিন্তু এই অত্যন্ত মূল্যবান রচনাটি আজও বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় নি। *Balts and Aryans* দুটি দেশের মধ্যে রচিত সম্পর্কের ইতিহাস নয়, একই ভাষাগোষ্ঠীর দুটি ভূখণ্ডে পৃথক-পৃথক ভাবে বৃদ্ধির ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের কাহিনী, কোনো অজ্ঞাত ঘটনাচক্রে সেই ভাষাগোষ্ঠী দুটি শাখায় কোন্ সুদূর অতীতে বিভক্ত হয়ে যায়, কিন্তু থেকে যায় কোনো নিগূঢ় আত্মীয়তা। এই গ্রন্থে ভারতের বৈদিক সাহিত্যের নিদর্শন আর বলটিক উপসাগরে প্রচলিত লোকগীতির নিদর্শন পাশাপাশি স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে বিচ্ছেদ সত্ত্বেও দু দেশের সাহিত্যের মধ্যে ভাষায় আর ভাবে সাদৃশ্য কত আন্তরিক।

অর্থাৎ সুনীতিকুমার বিশ্ব-সংস্কৃতি বলতে আঞ্চলিক বা জাতিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করে মসৃণ, সুষম, স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি পাষাণখণ্ডের মতো কোনো সংস্কৃতিকে বোঝান নি, বিশ্ব-সংস্কৃতি বলতে বুঝিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির চরিত্র ও প্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা, এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে একটি চেতনাকে।

এই ধারাতে সুনীতিকুমার সাধারণভাবে সংস্কৃতির একটি বিশেষ ক্ষেত্র বেছে নিয়ে সে বিষয়ে একক-ভাবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করে গেছেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রটি হল সাহিত্য। আইরিশ, টিউটোনিক, ফিন, চৈনিক, ভোট বা তিব্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির পুরাণ বা মহাকাব্য বা লোকপ্রিয় কাহিনী বাঙলায় লিখে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে "বৈদেশিকী" নামে প্রকাশ করেন গ্রন্থাকারে। পরে এই ধারাতে লেখেন *The World About Igor's Folk*, *Armenian Hero Legends and the Epic of David Sasun* প্রভৃতি প্রবন্ধ। এসব কাহিনীতে এক-একটি জাতির বিপুল 'সম্মিলিত অচেতন মনে'র প্রকাশ দেখা যায়। এই ধারাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল *World Literature and Tagore*. কিছু জাতিক সাহিত্য থাকে যেগুলির আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বজনীন আবেদন থাকে। সেই বিশ্বজনীন আবেদনসম্পন্ন সাহিত্যকে তিনি মহাভারত-রামায়ণ প্রভৃতি, হোমার

হোমারীয় প্রভৃতি, বাইবল, শাহনামা, আরব্যরজনী, আর্থার কাহিনী, শেকসপীয়র, টলস্টয়, গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ—এই দশটি সাহিত্যমণ্ডলে ভাগ করে সেগুলির পরিচয় ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণের চাইতে বিবরণ-ই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সুনীতিকুমার দেখেছেন, এই দশটি মণ্ডল বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ এবং এগুলির মধ্যে বিশ্বমানবের সৃষ্টিশীল মন প্রকাশ করেছে তার সমস্ত উচ্চতা আর গূঢ়তা, বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্য, মহিমা আর মহত্ত্ব। এবং আমরা সুনীতিকুমারের মধ্যে দেখি বিশ্বদ্ধর মনন ও সংস্কৃতির জন্যে অন্তহীন অন্বেষণ।

[উপরের প্রবন্ধটি আমার In Quest Of World-Culture (১৯৭৮) বইটির সংক্ষেপিত রূপে পুনরাবৃত্তি নয়, সম্পূর্ণ নতুন রচনা।]

ক্যাকটাস

শচীন মুস্তফী

রাত্রি নটা হবে প্রায়। রণদেব সরকারের আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। সারাটা দিন কাজ এমন কিছু করতে পারেন নি। বেলা একটা পর্যন্ত যা পেরেছেন মন দিয়ে করেছেন। তারপর ক্লাব থেকে দুপুরে ফেরার পথে মনের খেই কোথায় যে হারিয়ে গেল, এখনও তা খুঁজে পেলেন না। স্মৃতিপট থেকে এক-একটা হারানো-প্রায় ছবি নামিয়ে-নামিয়ে ঝাড়া-মোছা করে দেখতে লাগলেন। ঠিক যা খুঁজছিলেন হয়তো তার হদিস মিলল না। উঠি-উঠি করেও বসে রইলেন। একটা-একটা করে সিগারেট খেতে লাগলেন। ভাবলেন, আর কতক্ষণ এমনি উদ্দেশ্যহীনভাবে স্মৃতির গলিপথে বিচরণ করবেন! তবে কোথায় যাবেন? বাড়ি? কিন্তু বাড়ি কাকে বলে? এই চুয়ান্ন বছরের জীবনে আজ যেন কেমন গৃহহারা হয়ে গেলেন। থেকেও নেই। একেই কি থাকা বলে? বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেনট বাবুর্চি খিদমতগার সবই আছে—কিন্তু একের অভাবে সবই যেন শূন্য। আজ দশ বছর তো এইভাবে কাটল। তবে আজ হঠাৎ এমন হল কেন? ঘূর্ণায়মান চেয়ারে আস্তে-আস্তে দোল খেতে-খেতে উনি একটু হাসলেন। দুপুরবেলা ক্লাবের প্রেসিডেনট দুটি মালা নিয়ে বললেন, মি. সরকার, আমি কামনা করছি—আপনার বিবাহিত জীবন দীর্ঘ হোক, মধুর হোক, সুন্দর হোক। একটি মালা আপনার জন্যে আর একটি মালা আজ রাত্রে আমাদের হয়ে মিসেস সুতপা সরকারের গলায় পরিয়ে দেবেন।

সবাই হাততালি দিয়ে সমর্থন করল, অভিনন্দন জানাল। দীর্ঘ দশ বছর রণদেববাবু এই সপ্তাহটা নিজের ক্লাবে অনুপস্থিত থাকেন। আজ কেমন যেন তাঁর মন থেকে এই সপ্তাহের কথাটা মুছে গিয়েছিল। মালা তো ফেরানো যায় না। গাড়ির পেছনে মাথার কাছে ওই নিষ্প্রাণ মালা দুটি এখনও পড়ে আছে। নিষ্প্রাণ কি? হয়তো তারা মিটমিট করে তাকিয়ে আছে রণদেববাবুর দিকে। মুখ ভেংচে

বলছে, 'কী গো বুড়ো, কেমন মজা হল?'

হাঁ, তিনি তো আজ জীবনের মধ্যগগন উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। তাপ যেন ধীরে-ধীরে কমে যাচ্ছে। চৌরঙ্গি থেকে ডালহাউসি কতটাই বা পথ? কিন্তু এক দীর্ঘ মিছিলের প্যাঁচে আটকে গেলেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—বন্ধ কল খুলতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে—সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, পুঁজিবাদ নিপাত যাক—দুনিয়ার মজদুর এক হও। আমাদের দাবি মানতে হবে। জ্যৈষ্ঠমাসের কড়া রোদ উপেক্ষা করে সংগ্রামী মানুষের মিছিল অবিরাম চলেছে ফেস্টুনে পতাকায় সমস্ত রাস্তা ঢেকে দিয়ে। মানুষের এই দাবি কবে যে শুরু হয়েছে কেউ জানে না। কবে যে তার শেষ হবে, তাও কেউ জানে না। চাওয়া-পাওয়ার লুকোচুরি খেলা নিয়েই তো জীবন। এই যে মানুষের মিছিল খররৌদ্র উপেক্ষা করে দেহি-দেহি করে এগিয়ে চলেছে, মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিচ্ছে। রণদেববাবুও একটা কী যেন চাইছেন। পাচ্ছেন কি? বুঝতে পারছেন না। রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি। মহালয়ার সকালের সেই দেহি-দেহি ধ্বনি আকাশবাতাস বিদীর্ণ করছে। এক ঘণ্টা আগে তিনি মেট্রোর সামনে ছিলেন। এখনও তাই। সব গাড়িই স্টার্ট বন্ধ করে রেখেছে। ট্র্যাফিক পুলিশ সরে দাঁড়িয়েছে। গো অ্যাজ ইউ লাইক। একটা রোগাটে লম্বা কালো ছেলে বেল-ফুলের মালা বিক্রি করছে। বাসের কনডাকটর দাঁত বার করে হাসছে। একজন হাতের ঘড়ি দেখছে বারবার আর বিড়বিড় করে কাকে যেন শাপান্ত করছে। কে যেন বলল, 'আরে মশাই, বৃষ্টি আর এবার হবে না। খরায় সব শুকিয়ে যাবে।'

হঠাৎ কেমন একটা দমকা হাওয়া এসে রণদেববাবুকে যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। সুতপা এখন কোথায়? কেমন আছে? নিশ্চয় ভালো আছে। ভালো থাকলেই ভালো। কদিনের জন্য তিনি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন অফিসের কাজে। ফিরে এসে দেখেন বাড়ি খালি। সুতপা একটা চিরকুট ফেলে গেছে। 'চললুম। খোঁজ আর নাই বা করলে। পনেরোটা বছর তো একটানা কাটালুম। আর ভালো লাগল না। ভালো থেকো। কোনো ক্ষোভ নেই। আমার ভালোবাসা নিও।'

একদিন ভালোবাসার পথ ধরে সুতপা রণদেবের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ভালোবাসার মন্ত্রপাঠ করে তার ভিত দৃঢ় করেছিলেন। মনে হয়েছিল অচ্ছেদ্য। ভেবেছিলেন—একদিন তাঁরা নীলনদের বালুবেলায় বিচরণ করেছেন বা দুজনে খাইবারের গিরিপথ ভেদ করে সিন্ধু অববাহিকার দিকে যাত্রা করেছেন বা মণিকর্ণিকার ঘাটে অবগাহন করে বাবা বিশ্বনাথের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এ তো জন্মজন্মান্তরের মিলন। এই তো আমাদের বিশ্বাস, ধর্মমত। ভালো লাগল না বলেই কি এমনিভাবে চলে যেতে হয়। কেন ভালো লাগল না তার কারণ নির্ণয় করা উচিত ছিল। রণদেববাবুকে জবাব দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। পনেরো বছর একই ছাদের তলায় বাস করে দুজনে দুজনকে কি বুঝতে পারেন নি? সম্পর্কে হয়তো ধীরে-ধীরে চিড় খাচ্ছিল। ধীরে-ধীরে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছিল। তারপর একদিন তাসের ঘরের মতো সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই সেই সুতপা—একদিন তাঁকে না দেখতে পেলে কাতর হয়ে পড়তেন। না বলে গভীর রাতে ফিরলে উতলা হয়ে উঠতেন। আদরে সোহাগে ভালোবাসার উষ্ণতায় দুটি জীবনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন—দুজনে দুজনার। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ঈর্ষা করত। নিঃসন্তান ছোটো পরিবার সুখী পরিবার ভোগে-ভরা প্রাচুর্যে-ভরা পরিবার। একটা সন্তান হলে হয়তো ভালো হত। সুতপা তো কোনোদিন মুখ ফুটে বলেন নি। বরং বলতেন, 'বাবা! এই বেশ আছি। অত ঝামেলা আমি সইতে পারব না। ফিগার খারাপ হয়ে যাবে। আর এ বয়েসে মানায় না। লোকে বলবে কী?'

'কিসের বয়েস? কে বলেছে তোমার বয়েস হয়েছে?'

'বুঝেছি গো বুঝেছি। মানলুম তোমার কাছে সেই বিয়ের কনে খুকিটি আছি। কিন্তু লোকে তো তা স্বীকার করে না। আর দুদিন পর তো সব শেষ হয়ে যাবে। সে খবর রাখ?

'বল কী'?

'হাঁ গো মশাই, হাঁ। এখনই মাঝে মাঝে ট্রাবল দিচ্ছে।'

'আমায় বল নি কেন? চলো, ডাক্তার মজুমদারকে দেখাই।'

'ও তোমার বন্ধু না?'

'তা বটে। বেশ, মিসেস ডাক্তার পালিতের কাছে চলো। আজই।'

'হবে গো হবে। আজ আমার ইকাবেনা ক্লাশ আছে। জান তো—একটা গাছ একটা প্রাণ। দুঃখ কোরো না। আমি একাই তোমাকে ভরিয়ে দেব, কোনো অভাব জানতে দেব না।'

সুতপা সরকার রণদেব সরকারকে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর মৃণালভুজে কণ্ঠ বেষ্টন করে। দুটি কোরক এগিয়ে দিয়েছেন। পক্ক বিম্ব—'দাও।'

রণদেব সরকার দীর্ঘ দশ বছর পর আবার অনুভব করলেন এক শ্রোণীভারাক্রান্ত দেহবল্লরী, পেলব স্তন-যুগলের নিবিড় পেষণ।

সারা দেহে শিহরন জাগল। না, এখনও উনি মেট্রোর সামনে আছেন। ফেলিটি, দাই নেম ইজ উওম্যান।

কোনো-কোনো বন্ধু বলেছিল মামলা করতে। এ সিম্পল কেস অব অ্যাডালটরি। রণদেববাবু রাজি হন নি। তাতে প্রচার হবে। খবরের কাগজে সংবাদ হয়ে তাঁর নাম বার হবে। সবাই হাসবে। পেছনে বিদ্রূপ করবে। সুতপা তো ডাইভোর্স চান নি। অ্যালিমনি চান নি। সুতরাং চুপ করে ভুলে যাওয়াই ভালো। ভুলতে কি পারছেন? পত্নীত্যক্ত স্বামীর চিত্তদাহ যে কী গভীর, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ হয়তো বুঝতে পারবে না। প্রথম দিকে দীর্ঘদিন উনি আপিস আর বাড়ি ছাড়া কোথাও যেতেন না। না আত্মীয়-স্বজন, না বন্ধু-বান্ধব। আজও কারুর বাড়ি বড়ো একটা যান না। হয়তো অনেকে জেনেছে, কিন্তু কোনোদিন তা মুখে প্রকাশ করে নি। কোনো সান্ত্বনার বাণী প্রকাশ করে নি। তাঁর কাছে মিসেস সুতপা সরকার এখনও মিসেস সুতপা সরকার। অফিসিয়ালি সুতপা সরকার।

চেয়ার থেকে উঠে রণদেববাবু ডাক দিলেন, 'মেহের আলি।'

'জী হুজুর।'

'সব বন্ধ করো। আলো নেবাও।'

'সাব, ফাইলপত্তর নেবেন না?'

'না, আজ শুধু-হাত। এয়ার কনডিশনের মেশিন বন্ধ করো। গাড়ি রেডি?'

'জী, হাঁ।'

'আচ্ছা মেহের, ও ঘরে এখনও আলো জ্বলছে কেন?'

'মিসেস চৌধুরী কাজ করছেন।'

'বল কী? মিসেস চৌধুরী কাজ করছেন? এখনও? এ তো ভালো না। চলো চলো, দেখি।'

মিসেস চৌধুরী একা আপন মনে কাজ করে চলেছেন। রণদেববাবু বললেন, 'মিসেস চৌধুরী, ইট ইজ ভেরি ব্যাড। সমস্ত অফিস ঘুমিয়ে পড়েছে আর আপনি একা স্বপ্ন দেখছেন। আমার বদনাম হবে যে। বলবে বস নিপীড়ক হৃদয়হীন, অধস্তনদের দেখে না।'

'ছি ছি, এসব কী বলছেন স্যার। জানেন তো কাজটা কত জরুরি। সুদানে আমাদের যে টার্নকী প্রজেক্ট পেয়েছি তারই মেমোরানডামটা রেডি করছিলাম।'

'জানি কাজটা বড়ো জরুরি, কিন্তু জীবন? সেটা কি এমনই তুচ্ছ? কাজের চাকায় যদি এমনি করে পিষ্ট হবেন তবে জীবনের মাধুর্য কোথায় রইল?'

'স্যার, আর মিনিট পনেরো।'

'না। ফাইলটা আমায় দিন। আমি রাতে দেখে নেব। মেহের, তুমি বলছিলে না ফাইল নেই কেন? নাও, উঠিয়ে নাও। আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আপনি তো লেকটাউনে থাকেন। দেখুন দেখি, এত রাতে কী করে যাবেন।'

'স্যার, সাড়ে নটার সময় একটা মিনিবাস আছে।'

'চলুন, আমার গাড়িতে চলুন।'

'সে কী বলছেন স্যার? আপনি আলিপুরে থাকেন।'

'কোন কথা শুনব না মাই নটি গার্ল। উঠুন উঠুন।'

'আপনার কত কষ্ট হবে।'

'আর আপনার কষ্ট হবে না?'

'আমি তো তার জন্যে মাইনে পাচ্ছি।'

'আপনার ন্যায্য পাওনা কি পাচ্ছেন?'

'আমি তো সে কথা অনুভব করি না।'

'মিসেস চৌধুরী, আপনাকে এখনও দীর্ঘপথ চলতে হবে। বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলেই স্বীকার করবেন। তাকে অপব্যাখ্যা করে অযথা আত্মতুষ্টির চেষ্টা করবেন না। দেখবেন অনুভূতির ক্ষমতা যেন ভোঁতা হয়ে না যায়। আজ সারাটা দিন মিছিলে-মিছিলে নষ্ট হয়ে গেছে। চলুন দেখি রাস্তার অবস্থা কেমন। বাইপাস দিয়ে বেরিয়ে যাব।' দুজনে পেছনে উঠে বসলেন। রণদেববাবু বললেন, 'ভালো হয়ে আরাম করে বসুন। আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আপনার দেশ তো ফরিদপুর।'

'হাঁ, আমার শ্বশুরবাড়ি ফরিদপুর, কিন্তু বাপের বাড়ি বরিশাল। আপনার তো কুষ্টিয়া?'

'কী করে জানলেন? ওহো, আপনি তো আমার পি. এ.। এ গুড পি. এ. ইজ এ ফ্রেনড ফিলজফার অ্যানড গাইড। আপনার ছেলে কত বড়ো!'

'দশ বছর। নরেন্দ্রপুরে পড়ে। একমাত্র ছেলে।'

'ভেরি গুড। নিশ্চয় দশের মধ্যে আছে?'

'তা আছে।'

'যান তো মাঝে-মাঝে?'

'হাঁ। প্রতি রবিবার।'

'দেখুন, আপনার অনেক কিছুই আমি জানি না। অথচ আপনি আমার সবকিছুই জানেন। আমরা হিউম্যান রিসোর্স সম্বন্ধে কত-না গালভরা কথা বলি, কত সেমিনার করি, কিন্তু নিজেদের কর্মক্ষেত্রের পরিমণ্ডলে যাদের নিয়ে সংসার তাদের বিষয় কিছু জানি না, জানতে চেষ্টাও করি না। ম্যানেজমেনট আর ওয়ার্ক ফোর্সের আল দিয়ে নিজেদের পৃথক করে রেখেছি। আর চেঁচাচ্ছি দুনিয়ার মজদুর এক হও।'

'আপনার আজ অনেক কষ্ট গেছে। বছরের এ সপ্তাহে আপনি তো ক্লাবে যান না।

'কেমন যেন ভুলে গিয়েছিলাম।'

'সরি। আমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'কেন বলুন তো?'

'প্লাজ, ও বিষয় আর আলোচনা করবেন না।'

'মিসেস চৌধুরী, আমি আজ সারাটা দিন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ছিলাম। এখন আপনার সঙ্গে কথা বলে মনের দরজাটা কেমন যেন খুলে গেল। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে।'

'বলুন।'

'কী বলব।'

'যা আপনার ভালো লাগে।'

'সাড়া দেবেন কিন্তু।'

'দেব।'

'মাঝে মাঝে ভাবি জীবনে যা চেয়েছিলাম তা কি পেয়েছি?'

'সব তো পাওয়া যায় না।'

'এখন দেখছি এ হীপ অব ব্রোক্‌ন্ ইমেজেস।'

'তবুও মানুষকে আশায়-আশায় বাঁচতে হবে।'

'হায় আশা! জানেন, আমিও একদিন আশাবাদী ছিলাম। পাথরের মধ্যেও প্রাণের রস খুঁজে পেতাম। জগৎ তখন সুন্দর ছিল। মধুময় মধুময়। আর আজ আমি ডগ টায়ার্ড। একা-একা থাকলে মাঝে-মাঝে নিজের ছায়াকে ভয় পাই। মনের কথা

বলার একজন লোক পাই নি। যাকে কনফাইড করা যায়। না না, কী যা-তা বলছি? সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'আপনি বলুন।'

'মিসেস চৌধুরী, আজ আমি কেমন আপসেট হয়ে গেছি। যাকগে। সবাইকে তো সব কথা বলা যায় না। বলা উচিতও নয়। ভাবি যখন শিশু ছিলাম ভালো ছিলাম। রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখব্যাদান ছিল না। তখন কত স্বপ্ন দেখতাম। ছোটো-ছোটো সুখ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। আজ এত মাইনে, এত পারকুইজিট, এত ভোগের আয়োজন—সব যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে। আজ সেই ফেলে-আসা সোনার শৈশব কি ফিরে পেতে পারি না?'

'অতীতকে তো ফেরানো যায় না।'

'করেকট। জীবন বড়োই নিষ্ঠুর। যদি কিছু মনে না করেন, একটা সিগারেট ধরাই।'

'অক্লেশে।'

এত বড়ো একটা প্রতিষ্ঠানের এত বড়ো এক প্রতিষ্ঠিত অফিসারের জীবনযন্ত্রণায় মিসেস চৌধুরীর মনটাও কেমন যেন হুহু করে উঠল। মানুষটার সব থেকেও কিছুই যেন নেই। ট্রাজেডি। কেমন যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন। ভেতরে-ভেতরে পরতে-পরতে হয়তো পচন ধরেছে। দিনে-দিনে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে মনে হয় কেমন যেন হারিয়ে-হারিয়ে যান। আজ কেমন কাঙালের মতো ফেলে-আসা শৈশব ফিরে পেতে চাইছেন। সত্যি উনি কী চান? কোনো নিশ্চিন্ত পক্ষছায়া? না, স্নেহ-ভালবাসার আর্দ্র স্পর্শ? না, কোনো মরমি মনের অনুরণন? ওনার পার্সোনাল ফাইল মেডিকেল ফাইল সবই বিশ্বাস করে মিসেস চৌধুরীর কাছে গচ্ছিত রেখেছেন। তবু হয়তো কিছু বোঝা যায় না, চেনা যায় না। এইসব ফাইলের বাইরে হয়তো আর-একটা মানুষ আছে—নিজের যন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট। বললেন, 'জানেন মিসেস চৌধুরী, ডাক্তার বলে চিন্তা করবেন না। চিন্তা নাকি মানুষকে কুরে-কুরে খায়। হাইপারটেনশন একটা মারাত্মক রোগ—বিশেষ করে আমাদের মতো একসিকিউটিভদের কাছে। আচ্ছা বলুন তো, চিন্তা ছাড়া মানুষ কি বাঁচতে পারে? যখন চিতায় শোব তখনই চিন্তা দূর হবে।'

রণদেববাবু হা-হা করে হাসতে লাগলেন। মিসেস চৌধুরীর বুকটা অকস্মাৎ ছাঁত করে উঠল। এক অশুভ ইঙ্গিতবহ চেতনা তাঁর নারীহৃদয়তন্ত্রী মথিত করে দিল, অনেকদিন এই মানুষটার সান্নিধ্যে আছেন, কিন্তু কোনোদিন এমন বিষণ্ণতা এমন অসহায়তা এমন সমর্পণের আকুতি প্রকাশ পেতে দেখেন নি। ধীরে-ধীরে বললেন, 'স্যার, আপনার মনটা আজ খুব খারাপ। এতটা না এলেই পারতেন। আমার যেন অপরাধ বোধ হচ্ছে।'

'ছি-ছি! আপনি অহেতুক অপরাধ বোধ করবেন কেন? এ আমার ভাগ্য। ভাগ্যকে তো খণ্ডন করা যাবে না। কার ওপর সমর্পণ করি বলুন তো? ওই যে যথা নিযুক্তোঽস্মি……'

'আগে তো আপনি বেলুড়ে যেতেন প্রতি রবিবার সন্ধ্যায়।'

'এখন আর ভালো লাগে না; শুয়ে থাকি, বসে থাকি টিভি দেখি। রেস্ট—রেস্ট—পারফেকট রেস্ট। ওহো, মেহের আলি একটু থামো। ওই দোকানটা থেকে বিশ টাকার কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে এসো। মিসেস চৌধুরী, সন্দেশ তো কোনো ক্ষতি করবে না?'

'না। তবে সীমার মধ্যে থাকা চাই। আগামী বুধবার আপনার পি·পি করতে হবে। ওষুধটা ঠিক-মতো খাচ্ছেন তো?'

'দুপুরে তো আপনি পাঠিয়ে দেন। তাই কোনো চিন্তা নেই। তবে রাত্রে মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যায়, আর কত মনে রাখব? আলস্য—আলস্য।'

'ভুল হলে তো চলবে না, স্যার। আজকাল আপনি নিজের দিকে তেমন নজর দিচ্ছেন না।

আগামী কাল ওজনটা নিয়ে নেবেন।'

'নিজের জন্যে আর কত করব?'

'শুনবে কে? এখন তো আপনাকে দীর্ঘপথ যেতে হবে।'

'ও হো! আমার কথা আমায় ফিরিয়ে দিলেন।'

'আগামী মাসে আপনার তেহেরান যাবার কথা। থরো চেক-আপ চাই।'

'না, আর অফিসের কথা নয়। বলুন এবার আপনার কথা।'

'আমার কথা? হায় পোড়া কপাল! আমি তো রবিবাবুর সেই সাধারণ মেয়ে যে শরৎবাবুর কাছে তার বৃত্তান্ত লেখবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিল।'

'তবু তো তার শুরু আছে, শেষ আছে। বলুন।'

'আমার শুরু আর কোথায়? বলবার মতো আহামরি নয়। তবে শেষ আছে। ওই আমার কথাটি ফুরোল, নটেগাছটি মুড়োল।'

'কেন রে নটে মুড়োলি? হা-হা হা! কার লেখা বলুন দেখি? ছেলেবেলায় মার কাছে এসব ছড়া শুনতে এত ভালো লাগত! আজ কেন জানি না, মার কথা বড়ো মনে পড়ছে।'

লেক টাউনের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়েছে। মিসেস চৌধুরী বললেন, 'মেহের আলি, বাঁ দিকের গলিটায় চলো। হাঁ-হাঁ, এই বাড়ি। স্যার, আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি রাখেন খুশি হব।'

'বলুন'।

'নামতে হবে। আমার বাড়িতে একটু বসতে হবে। চা খেতে হবে।'

'কী যা-তা বলছেন? এত রাতে কোথায় আপনি মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে গল্পসল্প করবেন। না, না, আজ থাক, আর-একদিন হবে।'

'না, আমি কোনো কথা শুনব না, স্যার। আপনি দয়া করে আসুন। আপনার এভাবে চলে যাওয়া আমার সইবে না।'

'মেহেরকে ছাড়তে হবে। ওর রান্নাবাড়া আছে।'

'ঠিক আছে। মেহের এখানে খেয়ে যাবে। মেহের রাজ আছে।'

'দেখুন দেখি কী বিপদ! মেহের, মিষ্টির বাক্সটা নামাও।'

মিসেস কাজল চৌধুরী থাকেন দোতলায়। বাড়িটি খুব বেশিদিনের নয়। সিঁড়িপথে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। এর মধ্যেই অযত্ন অবহেলার ছাপ পড়েছে। একদিন হয়তো ফুলগাছ-পাতাবাহারের ব্যবস্থা ছিল। আজ সেখানে আবর্জনা আর সামান্য পানের ছাপ। মিসেস চৌধুরী ফ্ল্যাটের চাবি খুললেন। ভেতর থেকে খানিকটা বদ্ধ গরম হাওয়া বার হয়ে এল। বললেন, 'একটু দাঁড়ান স্যার, আলো জ্বালি।'

দপ করে টিউবলাইট জ্বলে উঠল। একখানি ঘরের ফ্ল্যাট। অর্থাৎ একখানি শোবার ঘর, সামনে বেশ চওড়া বসার ঘর, পাশে ছোট্ট রান্নাঘর আর খাবার জায়গা। বসার ঘরে সোফা সেট, সামনেই টিভি, বাঁ পাশে বুক-শেলফ, ডান পাশে ফ্রিজ। মিসেস চৌধুরী টিভির পেছনের দেওয়ালজোড়া চার-পাল্লার জানালাটা খুলে দিলেন। পরদা সরাতেই বাইরের দমকা হাওয়ায় ঘরটা ভরে গেল। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো টিভির ওপর মেঝের ওপর সোফার ওপর চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়তে লাগল। নির্মেঘ আকাশে চাঁদ। সামান্য একটু ক্ষয়ে গেছে। এই নিঃশব্দ পরিবেশ যেন মোহময় স্বপ্ন-মাদকতার সৃষ্টি করে। মাথার ওপর দ্রুতগতিতে পাখা চলতে লাগল। রণদেববাবু সোফার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এতক্ষণ পর আরামের নিশ্বাস ফেললেন, 'বিউটিফুল মিসেস চৌধুরী। সাহারার বুকে এ যেন এক মরূদ্যান। না এলে অনেক কিছু হারাতাম। এয়ারকনডিশনের বদ্ধ ঘরে থাকি। বাইরের এই আলো এই বাতাস যে কত জীবনদায়ী জানা যায় না। হাঁ। শুধু এক কাপ চা।'

'স্যার, এখন আপনি আমার গৃহবন্দী। আমার কথা শুনতে হবে।'

'দেখছি মোঘলের পাল্লায় পড়েছি।'

'আপনাকে বেশি কষ্ট দেব না। এখন সাড়ে নটা। আপনাকে সাড়ে দশটার মধ্যে ছেড়ে দেব। দয়া করে দুটো মুখে দিয়ে যেতে হবে। এখনই চা করে দিচ্ছি। বাথরুমে নতুন সাবান নতুন তোয়ালে দিয়েছি। চান করে এসে এই কাপড়টা পরুন। প্যানট পরে বাড়ির আরাম পাওয়া যায় না। কাপড়টাও নতুন।'

'এ কী করছেন? নতুন কাপড় কেন? আমি তো বামুন না।'

'আপনি আমার কাছে বামুনের চেয়েও বড়ো।'

'এসব না করলেই হত।'

'আপনাকে এই যে আজ আমি পেয়েছি, এ আমার বহু ভাগ্য।'

'তাও বটে। আমি তো আপনার বস।'

'দেখুন, আপনাকে বস বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই খাতির করছি না।'

'সরি। আমায় ক্ষমা করবেন। ভুল বুঝবেন না। হিউমার করেছিলাম। যদি না জেনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি, ভুলে যান।'

'যদি আমার কথা শোনেন তবেই ভুলব। দয়া করে চা-টা খেয়ে বাথরুমে যান। পরিষ্কার হয়ে বসে বই পড়ুন। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

রণদেববাবুর অ্যাপার্টমেনট আর এই এক ঘরের ফ্ল্যাট। আকাশপাতাল তফাত। কিন্তু এই সামান্য উপকরণে সজ্জিত এই সাধাসিধা ফ্ল্যাটটি রণদেববাবুর কাছে খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হল। ভদ্রমহিলার রুচি আছে। বইয়ের আলমারিতে কিছু বাছা বাছা বই। রবীন্দ্ররচনাবলী, শরৎরচনাবলী, বঙ্কিমরচনাবলী, কথামৃত, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, ট্রাজেডিজ অব শেক্সপীয়ার। ছোট্ট টুলে রজনীগন্ধার ঝাড়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-সুচিত্রা মিত্র কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের ক্যাসেট। মিসেস চৌধুরী বললেন, 'একা বসে-বসে বোর লাগবে। দাঁড়ান, টেপ চালিয়ে দিই। ভালো না লাগলে বন্ধ করে দেব।'

'দিন, সময়টা কেটে যাবে।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঝঙ্কারে সারা ঘরটা ভরে গেল। 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে।' এই পরিবেশে এই মানসিকতায় এই সুরমূর্ছনা। এ তো রণদেববাবুরই মনের কথা। এতদিন মনের গভীরে গুমরে-গুমরে মরছিল, প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। মিসেস চৌধুরী খুব আস্তে-আস্তে চালিয়ে দিয়েছিলেন। সুপ্তিমগ্ন বিশ্বচরাচর। জানালা দিয়ে সেই সুরলহরী ভেসে-ভেসে যেতে লাগল দূর থেকে দূরান্তরে বিশ্বসুরের আবর্তে। চলতে লাগল, 'তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে। খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয়ঝড়েতে। থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক না এখন প্রাণের মেলা—তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়বীণায় গাহিরে।'

'মিসেস চৌধুরী, অদ্ভুত আপনার নির্বাচন।'

'বাড়ি ফিরে ওই গানটা চালিয়ে দিই। মনটা শান্ত প্রসন্ন হয়। সমস্ত ময়লা ধুয়ে-ধুয়ে যায়। আর একটা ইন্‌স্‌পিরেশন। ভাবলাম আপনার হয়তো ভালো লাগবে।'

'এই পরিবেশে এর চেয়ে আর তো ভালোভাবে পুজার অর্ঘ্য দেওয়া যায় না। আচ্ছা, কবি তো সত্য-দ্রষ্টা। নইলে এইসব সত্য এইসব মানুষের দুঃখ-জ্বালা উনি উপলব্ধি করলেন কী করে। ভাবছিলাম ওনার পায়ে যদি মাথা নত করতে পারতাম সব জীবনযন্ত্রণা দূর হয়ে যেত। একটু আগেই না সমর্পণের কথা ভাবছিলাম। না, না বড়ো ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি। এবার আমায় ছাড়ুন।'

'স্যার, খাবার রেডি।'

সামান্য আয়োজন। এক বাটি টমাটো স্যুপ

ছোট-ছোট ফুলকো-ফুলকো সাদা ময়দার লুচি পটলের দম মটর পনির চিকেন স্টু দুটি সন্দেশ দু-চাকা হিমসাগর আম আর এক-কাপ দুধ। নিবিড় যত্নে খাবারের টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে বললেন 'স্যার, নির্ভয়ে খান। এখন দশটা দশ। তাড়াতাড়ি করবেন না। ঘি দিই নি। সফোলায় ভেজেছি।'

'আপনি তো বেছে-বেছে আমার শরীর অনুযায়ী খাবার করেছেন। তা মিস্টার চৌধুরীর জন্যে কী রান্না করলেন আর তিনিই বা কখন আসবেন?'

'জানি না।'

'না-না-না। শক্ত করে লাগাম ধরবেন। একদম আলগা দেবেন না।'

'জানেন তো স্যার, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।'

হঠাৎ রণদের সরকার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। দেখলেন আকাশে নিঃসঙ্গ চাঁদ ভেসে-ভেসে চলেছে। মেঘ নেই। চাঁদের আলোয় তারাগুলো নিষ্প্রভ। শক্ত করে লাগাম ধরলে কি সবকিছু ধরে রাখা যায়? মনের আগল যদি ভেঙে যায় তবে তাকে অনুষ্ঠানের দড়ি দিয়ে কতদিন বেঁধে রাখা যাবে? শংখবাবুর কমল বলেছিল, 'উনি যাবেন হয় নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তা হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার করতে? তার আগে গলায় দেবার মতো একটুখানি দড়িও জুটবে না নাকি?' একদিন উনিও তো অনুষ্ঠানের অকটোপাসে একজনকে বেঁধে নিশ্চিত বিশ্বাসে একচক্ষু হরিণের মতো সুখী জীবন-যাপনের মহড়া দিয়েছিলেন।

আজ কোথায় সুতপা সরকার আর কোথায় রণদেব সরকার। তবুও ভালো, সন্তান-সন্ততি হয় নি। কোন্ মুখে তাদের কাছে জবাবদিহি করতেন? মাঝে-মাঝে এই ব্যর্থতা এই একাকিত্ব পাথরের মতো গলায় বিঁধতে থাকে। দুঃস্বপ্নের ঘোরে রাত্রে বিছানা থেকে উঠে চোখেমুখে জল দেন। ঢক-ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়েন। গুনে যান এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন। সে এক বিভীষিকার রজনী।

বললেন, 'মিসেস চৌধুরী, অনেকদিন পর এমন তৃপ্তি করে খেলাম। ছেলেবেলায় মার কাছে যেমন খেতাম। উনি ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঠিক খাইয়ে দিতেন। বুঝতে পারতাম না কখন খাবারগুলো পেটে চলে গেল। সত্যি, মেয়ের জাদু জানে। দেখুন দিকি, কত বেশি খাওয়া হয়ে গেল।'

'কী আর খেলেন। আপনাকে এ খাইয়ে কোনো আনন্দ নেই। সামান্য উপকরণ।'

'বলেন কী? এই সামান্য উপকরণ অসামান্যভাবে জড়ো করেছেন, পরিবেশন করেছেন। সেটাই তো তার মাধুর্য। যাক, এবার আমি চলি। আপনি তো এখন খাবেন না। জানি না, মিস্টার চৌধুরী কত রাতে আসবেন।'

'তিনি আর আসবেন না।'

'কী বলছেন মিসেস চৌধুরী?'

'তিনি আজ প্রায় সাত বছর আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন।'

'হারিয়ে গেছেন?'

'হারানোই বলতে পারেন।'

'কাগজে রেডিওতে টিভিতে জানিয়েছেন?'

'কোনো প্রয়োজন বোধ করি নি।'

'কেন?'

'তিনি তাঁর এক মাদ্রাজি বান্ধবীকে নিয়ে বাঙ্গালোরে সংসার পেতেছেন।'

'আপনি অ্যাকশন নেন নি?'

'কেন?'

'খোরপোশ।'

'ছিঃ। আমি নিজে উপায় করি। নিজেকে বহন করতে পারি। চাই না আর কেউ আমায় বহন করুক। নারীর আর্থিক স্বাধীনতাই তার বড়ো সম্পদ। দুঃখ কী জানেন, আমায় বলে গেল না কেন? আমি কি তাঁর গলা ধরে কাঁদতাম?'

রণদেববাবু নির্বাক হয়ে বসে পড়লেন সোফার ওপর। যে বেদনা তিনি দীর্ঘ দশ বছর একা-একা

বহন করে ম্লান হয়ে পড়ছিলেন, এ যেন তারই আর-এক প্রতিচ্ছায়া। একই বেদনা একই ব্যর্থতার জ্বালা এই নারীও একাকী বহন করছেন দীর্ঘ সাত বছর। হাসি-খুশির আস্তরণের গভীরে যে কী ক্ষত সৃষ্টি হয়ে আছে তিলে-তিলে, যে কী ভীষণ অবক্ষয় চলছে, তার দিশা কে রাখে? ভাবলেন, হয়তো এ মেয়েটার কুড়ি বছরে বিয়ে হয়েছিল। এখন বয়স মনে হয় তিরিশ। বছর তিন বিবাহিত জীবন যাপন করেছে। হয়তো এক হাজার দিন। জীবনের দীর্ঘ মালায় এ কতটুকু? বেচারা এই স্মৃতি লালন করে আছে। 'সখি, বলিতে বিদরে হিয়া, আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।' পাঁচশ বছর আগে কোনো এক সমবেদনশীল কবি কোনো বেদনা-বিধুর নারীর দুর্ভার বিরহ-জ্বালা এমনই মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এ ঘটনা তো আজও ঘটছে। মিসেস চৌধুরী আনবাড়ির খবর রেখেছেন, কিন্তু মনে কোনো অভিযোগ নেই। ক্ষোভ নেই।

দুজনে বসে আছেন নিশ্চল নিথর, সমব্যথী। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। দুজনেই যেন ধ্যান করছেন। দুজনেই দুজনার দুর্ভাগ্যের বোঝার ভারে নিষ্পিষ্ট। চাঁদ একটু হেলে গেছে। বিশ্বচরাচর হয়তো সুপ্তিমগ্ন। বোধিদ্রুমতলে এক দুঃখক্লান্ত রাজনন্দন যেন এমনিভাবে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ দূর করার জন্যে।

কিন্তু দ্রুতগতিসম্পন্ন বর্তমান শতাব্দীতে এই দুঃখ-বিলাস অপচয়েরই শামিল। মিসেস কাজল চৌধুরী বলে উঠলেন, 'দেখুন দেখি, আপনার কত দেরি করিয়ে দিলাম।'

'না না। আই অ্যাম সরি, মিসেস চৌধুরী। একস্ট্রিমলি সরি। পুরোনো ঘায়ে লেগে গেলে আবার রক্তপাত হয়।'

'আপনি দুঃখ করতে যাবেন কেন? আমরা তো ইচ্ছে করে দুঃখের বেসাতি খুলে বসি নি। জানেন, একদিন আমরা যুগলে ফটো তুলেছিলাম। তার থেকে ওনার ছবিটা বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে একার ছবি করেছি। ওই দেখুন আমার শোবার ঘরে মাথার ওপরে টাঙানো আছে। ওই ছবি নিয়েই আমি আছি। ওই ছবি আমায় শক্তি দেয়। অতীতকে রোমন্থন করি আর আশায়-আশায় দিন গুনি।'

'কিসের আশা?'

'হয়তো একদিন ফিরে আসবেন।'

'কী করে বুঝলেন?'

'আমার মন বলে। জানেন মানুষটা বড় অসহায়। প্লাস ছয় পাওয়ার। সুগার চারশ উঠে যায়। কেমন আছে কে জানে। ভালো থাক সুখে থাক। আমার সেই তিনটে বছর তো কেড়ে নিতে পারবে না। সে আমারই আমার একার। বলুন, সত্যি কি না?'

মিসেস চৌধুরী হাসলেন। গালে এখনও চোখের জলের নোনা দাগ। হয়তো ভেতরে কান্নার দমক। হাসি-কান্না মেশামিশি হয়ে গেল। দমকে-দমকে হাসলেন। মেকি কৃত্রিম। বললেন, 'মেহেরের খাওয়া হয়ে গেছে।'

'মিসেস চৌধুরী, এই রাতের স্মৃতি আমার কাছে সম্পদ হয়ে রইল। সারাদিনটা আজ আমার দুঃস্বপ্নের ঘোরে কেটেছে। এখন বুক থেকে আমার অনেকটা ভার কমেছে। ভগবান এক-একটা মানুষকে দুঃখ বইবার এমন শক্তি দেন। আশ্চর্য। সবাই নিজের-নিজের বোঝাকে বেশি ভারী বলে ভাবে।'

'আমিও আপনার কাছে শিক্ষা পেলাম।'

'আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আসি।'

'আমাকে আপনি বুলা বলেই ডাকবেন।'

'কেন?'

'ওটা আমার আটপৌরে নাম।'

'এক গ্লাস জল দিন।'

'দাঁড়ান, ওষুধটাও খেয়ে নিন।'

রণদেববাবু আবার বসে পড়লেন। আশ্চর্য এই বুলা চৌধুরী। মনে হত কত কাছের মানুষ। এখন দেখা যাচ্ছে যোজন দূর। রূপের দিক দিয়ে এমন

আহামরি কিছু না। কিন্তু অন্তরে সম্পদ আছে। দুঃখ বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়ে মানুষটার অন্তরের সৌন্দর্য যেন পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। বিরহের একটা রূপ আছে। দ্বারকাধিপের অদর্শনে বিরহিণী রাধা যুগযুগ ধরে পথে-পথে কেঁদে-কেঁদে চলেছে। আজও সেই আর্তি যেন বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মথিত করে বিরহিণী রাধা রূপবতী রাধা।

মিসেস বুলা চৌধুরী দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। একটা কাঠের টবে একটা গাছের একটা মোটা পাতা কণ্টকাকীর্ণ। সবুজ সতেজ। দুর্দান্ত প্রাণশক্তি, দুর্দান্ত প্রতিরোধক্ষমতা, বেঁচে থাকার উদগ্র তাগিদ। কাঁটার আস্তরণে ঢাকা রসধারা। স্নেহ ভালোবাসা মায়া মমতা।

'ভারী সুন্দর ক্যাকটাস তো।'

'শ্যামবাজারের হাট থেকে কিনেছি।'

'এটাও একটা প্রতীক।'

'যা বলেন।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

রণদেববাবু মনে-মনে বললেন, 'সুতপা, তুমি ভালো থাক, সুখে থাক। আমি ভালো আছি। বেশ ভালো আছি। মেহের আলি ঘুমিয়ে পড় নি তো?'

'জী না।'

'চলো।'

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রদীপকুমার দাস

পৃথিবীর বর্তমান মানবগোষ্ঠীর প্রথম পুরুষেরা যখন আধুনিক মানুষের রূপ পরিগ্রহ করে, তার আগে তারা ছিল বন্য প্রাণী। পরবর্তী কালে, মেধা আর বুদ্ধির বলে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, ধীরে-ধীরে মানুষ-নামক বন্য প্রাণীটি প্রকৃতির উপর তার নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠে; অন্যান্য প্রাণীরা প্রকৃতির উপর যেভাবে সর্বতোভাবে নির্ভরশীল, মানুষ আর সেইরকম নির্ভরশীল হয়ে রইল না।

সভ্যতার বিকাশের ধারায় মানুষ একদিন কতগুলি প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শিখল। সে আগুন জ্বালাতে শিখল; শিখল কৃষিকাজ; চাকা আর নৌকা ব্যবহার করে দ্রুত পথ চলতে শিখল। এর পরের ইতিহাস শুধুই এগিয়ে যাবার ইতিহাস। এইভাবে কেটে যায় প্রাচীন আর মধ্য যুগ। ইতিহাসের এই পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠলেও, প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক ছিল সঙ্গতিপূর্ণ; প্রকৃতির উপর সে তেমনভাবে অত্যাচার করে নি।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ইউরোপে যখন থেকে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়, তখন থেকে এক নূতন অধ্যায়ের শুরু। এই সময় মানুষের উন্নয়নের ধারা প্রায় লাগামছাড়া গতিতে এগোতে থাকে। উন্নয়নের দুর্নিবার তাগিদে রাজহাঁসের সমস্ত সোনার ডিম একসাথে পাবার লোভে মানুষ নির্বোধের মতো প্রকৃতির উপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। নগরায়ন আর শিল্প-কারখানা বসানোর জন্য নির্বিচারে বনভূমি কেটে সাফ হতে থাকে। হারিয়ে যেতে থাকে কৃষি-জমি। কলকারখানা এবং অন্যসব সূত্র থেকে নির্মল বাতাস হতে থাকে কলুষিত। বাতাস ভরে যেতে থাকে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর নানারকম পদার্থে। রসায়নশিল্পের আগমনের পর থেকে শুধু বাতাস কেন, জল (নদী, এমনকী সাগরও পর্যন্ত), মাটি প্রভৃতি হারাচ্ছে তাদের বিশুদ্ধতা।

সভ্যতার বিনাশকারী এইসকল হাতিয়ারের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন অবশ্যই তেজস্ক্রিয় পদার্থ। মানব-সভ্যতা আজ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে যে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটুকরো বিশুদ্ধ মাটি, একফোঁটা বিশুদ্ধ জল, নির্মল বাতাস বা সূর্যের সোনালি আলো রেখে যেতে পারব কিনা। শেষের সেদিন খুব ভয়ংকর।

গত দেড় থেকে দুই দশক ধরে পরিবেশবিজ্ঞানী, বিভিন্ন গণসংগঠন, বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের পক্ষ থেকে পরিবেশদূষণের কুফল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চলেছে। এইসব আলোচনায় মূলত বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে দূষিত পরিবেশ মানবদেহের কীরকম মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। নানা সূত্রে পরিবেশের মধ্যে নানাভারে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর নানারকম পদার্থ এসে জমা হচ্ছে। এর ফলে মানুষ নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে, যেমন হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, এমনকী ক্যানসারে, আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ শুধু যে শারীরিকভাবে দুর্বল আর অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তাই নয়—জন্মের মতো পঙ্গুও হয়ে যাচ্ছে, এমনকী মৃত্যুও ঘটছে। গবেষণার ফলে এখন জানা যাচ্ছে যে, বর্তমানে পরিবেশদূষণের শিকড় আরো অনেক—অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। যত দিন যাচ্ছে পরিবেশ-দূষণের মাত্রা ততই মারাত্মক হয়ে উঠছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে—এর ফলে পৃথিবীতে মানুষসহ সমস্ত জীবের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে; পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দনই থেমে যেতে পারে।

এই মুহূর্তে বিশ্বপরিবেশের সামনে বিপদগুলি কী কী? অম্লবর্ষণ, বিশ্বব্যাপী তাপাঙ্কবৃদ্ধি, ওজোন স্তরে ছিদ্র হয়ে যাওয়া, বিপজ্জনক বিকিরণ, আণবিক বর্জ্যপদার্থের স্তূপ, মরু-বিস্তার, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বিনাশ, এবং সেই সঙ্গে ভয়াবহ জন-বিস্ফোরণ—ভবিষ্যৎ মানবজাতির পক্ষে ভীতিপ্রদ।

অ্যাসিড-বৃষ্টি

প্রতি বছর বিভিন্ন শিল্পসংস্থা বাতাসে প্রায় ৭০ মিলিয়ন টন বিষাক্ত গ্যাস, ২৫০ মিলিয়ন টন ধূলো এবং প্রায় ৩০,০০০ মিলিয়ন টন untreated water পরিবেশে মিশিয়ে দিচ্ছে। প্রতি বছর ২০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্বন মনোক্সাইড, ১৪৬ মিলিয়ন টন সালফার ডাই-অক্সাইড এবং ৫৩ মিলিয়ন টন নাইট্রিক অকসাইড পৃথিবীর সাথে এসে মিশছে। বাতাসের এই কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বৃষ্টিজলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে কার্বলিক অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করে। ফলে বৃষ্টির জলে অম্লতা (অ্যাসিডিটি) বৃদ্ধি পায়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে মিশে বৃষ্টির জলের নিম্নতম PH-এর মান ৫.৬ মতো হয়ে থাকে। এই PH-এর দ্বারা কোনো তরলের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপ করা হয়। PH-এর মান ৭-এর থেকে যত কম হবে, অম্লত্বের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পাবে। অ্যাসিড-বৃষ্টি আজ এক ভয়ংকর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাসিড-বৃষ্টির হাত থেকে এই ভারতবর্ষও মুক্ত থাকতে পারছে না। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা অদূর ভবিষ্যতে অ্যাসিড-বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হবে। পৃথিবীর আরও চারটি দেশ—চীন, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া আর ভেনেজুয়েলায় একই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চীনের ইউয়ান প্রদেশে দুই হাজার হেকটর জুড়ে বিস্তৃত বিশাল পাইন অরণ্য অ্যাসিড-বৃষ্টিতে ঝলসে গিয়েছে। বন্যপ্রাণীরা হয় মারা গিয়েছে, নয়তো পালিয়ে গিয়েছে। ভারতের কর্ণাটক আর কেরল রাজ্যের মাটি অ্যাসিড-বৃষ্টির অনুকূল। এই অ্যাসিড-বৃষ্টি হ্রদের এবং অন্যান্য জলাশয়ের জলের অম্লতা বৃদ্ধি করে। ফলে প্লাঙ্কটনের পরিমাণ কমে যায়। এই প্লাঙ্কটন হচ্ছে মাছের অন্যতম খাদ্য—তাই মাছের পরিমাণ হ্রাস পায়। সাধারণত এইসব হ্রদের জলের নীচে জমে-থাকা পারদ

এই অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে একরকম ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে। এই পদার্থের নাম মারকারি মেথিলেট। জলজ প্রাণী আর উদ্ভিদের পক্ষে এই পদার্থটি মারাত্মক রকম ক্ষতিকর। উত্তর কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলিতে বিভিন্ন হ্রদের মাছেদের উৎসগুলি এই অ্যাসিড-বৃষ্টিতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নরওয়ের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সেখানে ৯৬০টি লেকের মধ্যে ৬৯০টি লেক হয় মৎস্যশূন্য অথবা মৎস্যবিরল। জলাশয়ের এই অ্যাসিড-বৃষ্টি মাটির অম্লতার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে, মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার স্বল্পতা লক্ষ করা যায়। এই অ্যাসিড আরো মারাত্মক ক্ষতি করছে প্রাচীন স্মৃতিসৌধ ও অনন্যসুন্দর পুরাকীর্তিগুলির। ওইসব পুরাকীর্তিগুলির পাথর অ্যাসিড-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যায়, গলে যায়। তাই আজ রোমের কলোসিয়াম, অ্যাথেন্সের পারথেনন এবং আগ্রার তাজমহলের সৌন্দর্যহানি ঘটছে। দিল্লীর লালকেল্লা, কুতুবমিনার, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো শিল্পকীর্তিগুলিও আজ বিপদের সম্মুখীন।

পৃথিবীর তাপমাত্রার বৃদ্ধি

পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের মতে একদিকে পরিবেশদূষণের বল্গাহীন মাত্রাবৃদ্ধি, অন্যদিকে নির্বিচারে বনভূমির সংহার—এই দুই ঘটনার যৌথপ্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত একশ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ আরও আট ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পরে এই গ্রহের তাপমাত্রা আর কখনও এতটা বৃদ্ধি পায় নি। যে ঘটনা পৃথিবীর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী সেই ঘটনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে গ্রীন হাউস এফেকট। আবহমণ্ডলে এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের বল্গাহীন বৃদ্ধিই এই গ্রীনহাউস এফেকটের মূল কারণ। আবহমণ্ডলে এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাদর সূর্যের আলোক পৃথিবীতে প্রবেশ করার সময় বাধা দেয় না, কিন্তু সূর্যকিরণের দরুন সৃষ্ট উত্তাপের বেশি অংশটাই এই গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠে আটকে রাখে। কিন্তু এই গ্যাসের পরিমাণবৃদ্ধির দরুন এই উত্তাপের অনেকটাই থেকে যাচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে, আর তার দরুন বাড়ছে এই গ্রহের তপেমাত্রা। আর এর ফলে গলে যাচ্ছে মেরুপ্রদেশের বরফ এবং সেইসাথে বাড়ছে তাবৎ মহাসমুদ্রের জলতলের উচ্চতা। একসময় প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য আবহাওয়া এতটা গরম হয়ে উঠবে যে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের সমস্ত বরফ গলে গিয়ে প্রতিটি মহাসাগরের জলতলের উচ্চতা ২০ মিটার উঠে আসবে। পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ অংশ জলে ডুবে যাবে আর সেই সঙ্গে ডুবে যাবে জীবজগতের এক বিরাট অংশ। এখানে বলা দরকার, কলকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া এবং গাছকাটার দরুন প্রতিবছর পৃথিবীর বাতাসে ৬৪০-৮৫০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড এসে মিশছে।

আরও একটি ভয়ংকর দুঃসংবাদ এসেছে কুমেরু মহাদেশ থেকে। ওখানে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের স্তরে একটা বড়ো রকমের ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে উপস্থিত এই ওজোন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে আসতে দেয় না। এই রশ্মি সৃষ্টি করতে পারে ত্বকের ক্যানসার, চোখের ছানি এবং দুর্বল করে দিতে পারে মানুষের রোগ-প্রতিরোধব্যবস্থা। উদ্ভিদের জীবনের পক্ষেও এই অতিবেগুনি রশ্মি অত্যন্ত ক্ষতিকর। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা প্রথম এই ঘটনা লক্ষ করেন। ১৯৭৪ সালে এই ঘটনা প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে। হিমশীতল এই মহাদেশটির উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এই স্তরে এই ছিদ্র বিস্তৃত হয়েছে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা গত দশ বৎসর যাবৎ অনেক পরিমাপ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। ওই ওজোন স্তরে সূর্য

থেকে আগত ৯৯% অতিবেগুনি রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যায়।

পারমাণবিক শৈত্য

কিন্তু দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। পরিবেশদূষণের থেকে আর-একটা মস্ত বড় বিপদের সম্ভাবনা আছে। পরিবেশ কলুষিত হওয়ার দরুন বাতাসে জমা হচ্ছে প্রতিদিন কার্বন মনোক্সাইড, সালফার কণা ইত্যাদির মতো নানা ধূলিকণা, বালি ইত্যাদি। আর এর ফলে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়া আর ধূলির যে আস্তরন—তা জমাট বাঁধতে-বাঁধতে একদিন এতটাই পুরু হয়ে যাবে যে তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে সূর্যের আলো। আর সূর্যকিরণের থেকে পাওয়া উত্তাপের অভাবে মানুষ আর অন্য সব প্রাণী বাঁচবে কী করে? সূর্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদের খাদ্যপ্রস্তুতিই বা হবে কীভাবে? কারণ সালোকসংশ্লেষপদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হল সূর্যের আলো। তাই উদ্ভিদও মরবে। তার ফলে এই গোটা গ্রহটাই হয়ে উঠবে এক মৃত্যুপুরী। এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণত দায়ী মানুষের নির্বুদ্ধিতা। তবে আশার কথা, এখনও সতর্ক হলে আমরা এই অবস্থাটা এড়িয়েও যেতে পারব; কারণ এই ঘটনা ঘটতে এখনও অনেকটা সময় বাকি আছে, তাই নিরাময়ের সুযোগও আছে। কিন্তু অপরিণামদর্শী কিছু রাষ্ট্রনায়কের হঠকারিতার দরুন যে-কোনো সময় একই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এই মুহূর্তে যদি পৃথিবীতে একটা পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যায়, তবে কী হবে? আগুনে ঝলসে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বে তাবৎ জীবজগৎ। যদিও তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ বা বেঁচে গেল, তবে তার যা দুর্দশা হবে তাতে সে মৃত মানুষদেরই হিংসে করতে বাধ্য হবে। খাদ্য বা অন্যান্য উপকরণের কথা বাদই দিলাম। পৃথিবী-নামক এই গ্রহটি তখন হবে প্রেতপুরী। সারা পৃথিবীতে বিরাজ করবে এক অদ্ভুত নৈশব্দ্য, আর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। ওই সময় সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ, পরমাণু-বোমার আঘাতে পৃথিবীর সব নগর, শহর, গ্রাম ও অন্যান্য জনপদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বিপুলপরিমাণ ধুলো-ধোঁয়ার পাহাড় ছড়িয়ে দেবে আকাশে, তার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে সূর্যের আলো। আর সূর্যকিরণের উত্তাপের অভাবে এই পৃথিবীটা হয়ে উঠবে এক হিমশীতল উপত্যকা। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাটার নাম দিয়েছেন নিউক্লিয়ার উইনটার বা পারমাণবিক শীতকাল।

সোভিয়েত রাশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ আরো কয়েকটি উন্নত আর উন্নয়নশীল দেশের ভাঁড়ারে এমন সব পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে যা কয়েক লহমায় এই গ্রহটিকে বেশ কয়েকবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলতে পারে। এইসব অস্ত্রগুলি যদি ব্যবহার নাও করা হয়, তাহলেও তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে আমাদের অব্যাহতি নেই। কেননা আজ বিদ্যুৎ-উৎপাদন, কৃষি আর নানা প্রগতিমূলক কাজে পরমাণুশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে, পরমাণুশক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারও কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? বোধহয় নয়। ১৯৮৬ সালের গোড়ারদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী কয়েক দশকে মৃত্যু হবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের, স্থায়িভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে ততোধিক ব্যক্তি এবং বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এক বিরাটসংখ্যক শিশু। চেরনোবিলই প্রথম নয়—এর আগেও এরকম ছোটো-বড়ো অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থ্রী মাইল আইল্যানডের দুর্ঘটনা। প্রযুক্তিবিদ্যায় দারুণ উন্নত এই দুই বৃহৎ শক্তি যখন তাদের বিদ্যুৎশক্তিকেন্দ্রগুলিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে সক্ষম নয়, তখন অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তবে পরমাণু-

শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রবক্তারা দাবি করেন যে পরমাণু-বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটা নিছকই দুর্ঘটনা। তাঁদের বক্তব্য যে, পরমাণুশক্তিকেন্দ্রে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি তাঁদের বক্তব্য মেনেও নেওয়া যায়, তবেও কি ওইসব বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই? বিশেষজ্ঞদের মতে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই। আর যতই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন, এই বিপজ্জনক বিকিরণকে কখনই সম্পূর্ণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

এখানেই শেষ নয়। পরমাণুকেন্দ্রের বর্জ্যপদার্থ আর জ্বালানির অবশেষও আসলে তেজস্ক্রিয় পদার্থই। তাই এদেরকে মুক্ত অবস্থায় ফেলে দেওয়া যায় না; কেননা, কোনো-কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক আয়ুসীমা প্রায় ২৪ হাজার বছর। এদের রক্ষণাবেক্ষণ করাও হাতি পোষার শামিল। কয়েকটি দেশ এই আণবিক বর্জ্য পদার্থকে পুনর্বাসিত করার এক সহজ পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল। তার ১৬০০ বাকসে ভরতি আণবিক বর্জ্যপদার্থ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। সমুদ্র জলের স্রোতের টানে এইরকম কয়েকটি বাক্স যদি কোনো ভূকম্পনপ্রবণ এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হয়, এবং জলের চাপে ভেঙে যায়, তবে সমুদ্রজলের সাথে মিশে যাবে ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থের এক মস্ত বড়ো ভাণ্ডার। ফলে সমুদ্রটাই হয়ে উঠবে ভয়ংকর দূষিত। সমুদ্রের সমস্ত উদ্ভিদ আর প্রাণী মারা পড়বে। তার থেকেও বড়ো কথা—এত বড়ো একটা দূষিত জলের ভাণ্ডারকে প্রতিবেশী করে আমরা বেঁচে থাকতে পারব কি? অবস্থাটা চিন্তা করতেও গা শিউরে ওঠে।

অরণ্যসংহার

এতক্ষণ যেসব আলোচনা করা হল তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ দূষিত করার ফল সম্বন্ধে জানা গেল। এখন আলোচনা করা হবে নির্বিচারে গাছকাটা আর বনভূমি সাফ করে ফেলার প্রতিফল নিয়ে। বনভূমি নির্বিচারে নিধন করার সাথে পরিবেশদূষণের কি কোনো সম্পর্ক নেই? অবশ্যই আছে। কারণ গাছ বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় এবং অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। ফলে বাতাসে অক্সিজেন আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে একটা ভারসাম্য বিরাজ করে। নির্বিচারে বন কেটে ফেলার দরুন এই ভারসাম্য দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, এবং বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ার ফল কী হয়েছে তা নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বনভূমি হল ভূ-পৃষ্ঠের ফুসফুস। আজ যদি সব গাছ কেটে ফেলা হয়, তবে পৃথিবীর তাবৎ জীবজগতের অবস্থা হবে বায়ুহীন মুখবন্ধ বেলজারে রাখা ইঁদুরটির মতো। অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রাবল্যে এবং অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য দমবন্ধ হয়ে জীবজগৎ মৃত্যুবরণ করবে। গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে, বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে, পতিত জমি উদ্ধার করে এবং মরুভূমির বিস্তার রোধ করে। বৃষ্টিপাতের অভাবই খরা। আর বেশিদিন অনাবৃষ্টি আর খরা মানেই মরুভূমির অগ্রগতি। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখিয়েছেন যে, কোনো দেশে মোট ভূমির অন্তত ৩৩ শতাংশ অঞ্চলে বনভূমি থাকা উচিত। দুঃখের বিষয়, নির্বিচারে বন কেটে ফেলার জন্য বেশির ভাগ দেশে এই নিম্নতম পরিমাণের বনভূমি নেই। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মরুভূমি বিস্তারলাভ করছে। আর বনভূমি সংকুচিত হওয়ার ফলে বন্য প্রাণীর সাম্রাজ্যও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। মানুষের অজ্ঞতা আর হঠকারিতার দরুন শত-শত প্রজাতির প্রাণী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরিশাসের ডোডো পাখি। ১৬০০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবী থেকে প্রায় ১৯৬টি প্রজাতির প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান কালেও অনেক প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির পথে। ফলে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সবশেষে আমি আলোচনা করব জনবিস্ফোরণ নিয়ে। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৫০ কোটি, সেখানে ১৮৫০ সালে ওই সংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছয়। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে ২০০ বছর। কিন্তু এখন মাত্র ৩৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০০ সালে পৌঁছবার আগেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৬০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৫০ সালে যেখানে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২০০ কোটি, সেখানে ২০০০ সালে সেই জনসংখ্যার সঙ্গে যোগ দেবে আরো ৪০০ কোটির বেশি মানুষ। সুতরাং চলতি ৫টি দশক ধরে পৃথিবীতে একটা জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যদি এইভাবে চলতে থাকে, তবে আগামী পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা এমন একটা স্তরে পৌঁছবে যখন মানুষের মোট ওজন পৃথিবীর মোট ওজনের সমান হয়ে যাবে। এত লোকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা এই পৃথিবীতে হবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার মোট ওজন পৃথিবীর স্থলচর অন্যান্য সকল প্রাণীর মোট ওজন থেকেও বেশি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে: এই জনবিস্ফোরণের দায় কি মানুষের? অবশ্যই। কেননা মানুষ যেভাবে গড় আয়ু বৃদ্ধি করতে পেরেছে সেভাবে কিন্তু জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। যদিও এই ব্যর্থতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির, তথাপি দুর্ভোগটা তো পোহাতে হবে সারা পৃথিবীকেই।

জনবিস্ফোরণের সাথে পরিবেশদূষণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। জনসংখ্যা বাড়ছে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধেই। মানুষই আজ সবচেয়ে বড়ো খাদক ও শোষক। পরিবেশের বহনক্ষমতার সাথে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। জনসংখ্যার এই লাগামছাড়া বৃদ্ধির দরুনই পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জনসংখ্যার মোট ভার আর চাহিদা পরিবেশের মোট বহনক্ষমতাকে একদিন ছাড়িয়ে যাবেই। তখনই নানারকম বিশৃঙ্খল অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। খুবই আশঙ্কার বিষয় যে, এভাবে পরিবেশের তথা প্রকৃতির যে স্থায়ী বিকৃতি ঘটছে, তার ফলে পরিবেশের জীবপালনক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে খাদ্যোৎপাদন চাহিদামতো বাড়াতে হবে। কিন্তু জমির খাদ্যোৎপাদনের একটা ঊর্ধ্ব সীমা আছেই। ফলে খাদ্যভাণ্ডারে একদিন টান পড়বেই। ফলস্বরূপ বুভুক্ষা, অপুষ্টি, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তা ছাড়া, মানুষের বাসস্থানের জন্য কৃষিজমিও ব্যবহার করা হবে। জনপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকবেই। সেদিক দিয়েও খাদ্যোৎপাদনের সুযোগ কমবে। চাপটা গিয়ে বনভূমির ওপর পড়বে। আবার খাদ্য হিসাবে বন্যজন্তুর একটা অংশ চিরকালের জন্য মানুষের পেটে হারিয়ে যাবে। ফলে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার বাড়তেই থাকবে। সাথে-সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হবে। ফলে, দ্রুত এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে যা মানুষের বেঁচে থাকবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক হার ও তার অপ্রতিরোধ্য চাপই পরিবেশদূষণের মূল কারণ।

যে প্রকৃতি একদিন মানুষের নির্দয় অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে, আজ সেই প্রকৃতিই দ্বিগুণ তেজে সেই অত্যাচারের অনেক-অনেক গুণ বেশি প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এসেছে। প্রকৃতির রুদ্ররোষে মানুষ আজ দিশেহারা, কোণঠাসা। যদিও প্রকৃতির কিছু স্থায়ী বিকৃতি ঘটে গেছে যার আর কোনোরকম নিরাময় করা সম্ভব নয়, তথাপি এখন থেকেও সতর্ক হলে এখনও আসন্ন সংকটকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। এখন আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে বিচক্ষণ আচরণ করতে হবে, এবং প্রকৃতিকে নিরাময় করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককেই কাঁধে তুলে নিতে হবে। এখন আর অতিরিক্ত ভোগলালসা নয়, আর নির্বুদ্ধিতা নয়, আসন্ন সংকটের মোকাবিলার স্বার্থে প্রকৃতির প্রতি যদি প্রেম নাও দেখাতে পারি, তবে তাই হোক, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যেন প্রকৃতির ওপর অত্যাচার না করি। এটা না করতে পারলে আমরাই শেষ হয়ে যাব।

অবস্থাটা আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর যে-কোনো জীবেরই জীবনের পক্ষে অস্তিত্বসংকট দেখা দিয়েছে। যদিও এই অবস্থাটার জন্য একান্তভাবে এবং একমাত্র দায়ী মানুষ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে এই মানুষ যারা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব বলে পরিচিত।

গ্রন্থসমালোচনা

রামমোহন

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

১৯৫৮ সালে বিপিনচন্দ্র পাল জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ—*Studies in the Bengal Renaissance*। গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এমন সুপরিকল্পিত স্মরণ-গ্রন্থ এদেশে খুব বেশি চোখে পড়ে না। বাঙলার নবজাগরণের নানা দিক নিয়ে নানা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে লেখানো হয়েছিল সে-গ্রন্থে। সব নিবন্ধ সম-মানের না হলেও গ্রন্থটির সুপরিকল্পনাটি চোখ এড়াবার নয়। সম্প্রতি রামমোহনের মৃত্যুর সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায় স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত "রামমোহন-স্মরণ" গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্তের পরিকল্পনাটির কথা বারে-বারে মনে পড়ে। রামমোহনের স্মরণে এদেশের নবজাগরণের পর্যালোচনা হতে পারত রামমোহনের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। আলোচ্য গ্রন্থটির পিছনে সেরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। সংকলনগ্রন্থটিতে অনেকগুলি প্রবন্ধ নূতন রচিত, কয়েকটি পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ "দুষ্প্রাপ্য" বিচারে পুনর্মুদ্রিত, দুষ্প্রাপ্য নয় এমন প্রবন্ধও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কয়েকটি ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত এবং 'পরিশিষ্ট' অংশে আছে রামমোহনের কয়েকটি রচনার তর্জমা, রামমোহন-সম্পর্কিত কয়েকটি চিঠি, ব্রাহ্ম-সমাজের ন্যাসপত্রের আংশিক তর্জমা, ফরাসি থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ-রচনা এবং রামমোহন-রচিত গ্রন্থ ও রামমোহন-সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের এক সংক্ষিপ্ত সূচী। সব মিলে প্রায় ৪৮৫ পৃষ্ঠার আয়োজন। সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রকাশন-সমিতিতে বেশ কয়েকটি শ্রদ্ধেয় নাম রয়েছে। নিবন্ধ-রচয়িতাদের মধ্যেও বিশেষজ্ঞেরাই স্থান পেয়েছেন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে বছর ছয়েক সময় লেগেছে। তাতে উদ্যোক্তাদের কুণ্ঠিত হবার তেমন কারণ আছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে যে অব্যবস্থিত দশা চলেছে, তাতে একটি অস্থায়ী সংস্থার পক্ষে এর চেয়ে দ্রুততা আশা করা যায় না। বিশেষত অনেক প্রতিষ্ঠিত সংস্থাও যেখানে স্মরণগ্রন্থপ্রকাশে রীতিমতো দীর্ঘ-সূত্রী হয়ে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৮ বছর কেটে গেলেও তাঁর ১২৫তম জন্মস্মারকগ্রন্থের প্রকাশ এখনও ঘটে নি। "রামমোহন-স্মরণ" সংকলনটি প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশন-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীকমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়এবং তাঁর সুযোগ্য সহযোগী শ্রীসুবিমল লাহিড়ী অসুস্থতা এবং ব্যস্ততা সত্ত্বেও যে-যত্ন নিয়েছেন তা আধুনিক কালে সর্বক্ষেত্রে যে নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার পরি-প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। এসব প্রসঙ্গ গ্রন্থের সম্পাদকীয় নিবেদনে সবিস্তারে স্বীকৃত নেই। তবু যথাযথ স্বীকৃতির অভাবে গ্রন্থসম্পাদনা এবং গ্রন্থপ্রকাশের অনেক ইতিহাস পাঠকের না-জানা থেকে যায়, ফলে বহু ত্রুটি যাঁদের প্রাপ্য নয় তাঁদের উপরেই বর্তায়, এবং যে-কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য তা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত থেকে যান। ইতিহাস এ-পথেই ত্রুটিযুক্ত থেকে যায়। সেই কথা ভেবেই এসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল।

গ্রন্থপ্রকাশে কয়েক বছর কেটে যাওয়ায় সম্পাদক-মণ্ডলীর দুজন এবং কয়েকজন নিবন্ধরচয়িতা গ্রন্থটি

রামমোহন-স্মরণ, মৃত্যু-সার্ধশতবর্ষপূর্তি-সংকলন। রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা-সমিতি। পরিবেশক: প্যাপিরাস। পৃ (১-১৩)+১-৩৯০+১-৭০, চিত্রসংবলিত। চল্লিশ টাকা।

দেখে যেতে পারেন নি। ফলে উদ্যোক্তাদের মনকষ্টের কারণ তো ঘটেইছে, পাঠকও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বঞ্চিত হয়েছেন সম্পাদনার ব্যাপারে। পুলিনবিহারী সেন এবং সোমেন্দ্রনাথ বসু প্রয়াত হয়েছেন, অপর দুই সম্পাদক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসও তাঁদের সাম্প্রতিক দৈহিক অপটুতার কারণে যথেষ্ট মনোনিবেশ করতে পারেন নি মনে হয়। ফলে সংকলনগ্রন্থটির কাছে যে-বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশিত ছিল, তা অর্জিত হয় নি।

সংকলন-গ্রন্থটির পরিকল্পনা প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করা হয়েছিল। নিবন্ধগুলির শিরোনাম দেখে মনে হয় পরিকল্পনা ছিল রামমোহন-কেন্দ্রিক অর্থাৎ রাম-মোহনের দেশচিন্তা, অর্থনীতিচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, আন্তর্জাতিকতাবাদ, ধর্মচিন্তা, ব্যাকরণচিন্তা, রাম-মোহনের চিন্তায় খ্রীষ্টধর্ম, নারীমুক্তি, বেদান্ত এবং রামমোহনের গান—নানা দিক দিয়েই রামমোহন পর্যালোচনার চেষ্টা হয়েছে। সংকলনগ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে "রামমোহন-স্মরণ"—"স্মরণ" শব্দটির মধ্যে কিছুটা শ্রদ্ধাভক্তির ব্যঞ্জনা আছে, সমীক্ষা নয়। সমীক্ষায় আশা করা যায় খানিকটা বিচার। বর্তমান গ্রন্থের বেশ কয়েকটি নিবন্ধে ভক্তিরস রীতিমতো উচ্চকিত। ফলে, আধুনিক বিচারশীল পাঠক এজাতীয় প্রবন্ধ থেকে খুব বেশি লাভবান হবেন বলে মনে হয় না। রামমোহনের মৃত্যুশতবর্ষপূর্তিতেও *The Father of Modern India* নামে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হয়ে-ছিল। তাতে এমন ভক্তির প্লাবন ছিল না। বর্তমান সংকলনে ভক্তিপ্রাবল্যের এক তর্কাতীত দৃষ্টান্ত শিবদাস ভট্টাচার্যের "বিশ্বমানব রামমোহন" নামে দুই পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমেরিকায় দাসপ্রথাবিরোধী সম্মেলনে উপস্থিত এক সদস্য "রামমোহন রায়" ছদ্মনাম গ্রহণ করে তার কৈফিয়তে বলেছিলেন 'allow me to assume the name of one of the most enlightened and benevolent of the human race now living'। ঘটনাটি স্মরণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে এই ঘটনার উল্লেখই যদি বিষয়বস্তু হত পাঠক লাভবান হতেন, দুই পৃষ্ঠার পরিসরে দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে রামমোহনের পরিবারের যোগ থেকে শুরু করে ইংল্যাণ্ডের ভাববাদী সমাজতন্ত্রী নেতা রবার্ট ওয়েন ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে রামমোহনের পত্রালাপের চকিত উল্লেখমাত্র করে 'রামমোহন বাঙালির, রামমোহন ভারতবাসীর, রামমোহন বিশ্ব-মানবের'—এমন সিদ্ধান্ত একটু উচ্ছ্বাসময় বলে মনে হবে। বিষয়ের বিচারে একই পথে হেঁটেছেন দুই নিবন্ধকার—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীনির্মাল্য বাগচী—একজন লিখছেন "দেশাভিমানী রামমোহন", অপরজন "রাজনীতি ও দেশাত্মবোধ"। দুটিই যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ সুলিখিত প্রবন্ধ। উভয়েই উল্লেখ করেছেন ফরাসি বিপ্লবের চিন্তানায়ক কন্দর্সে বা কণ্ডরসেটের সঙ্গে তরুণ রামমোহনের যোগাযোগের প্রসঙ্গ। তবে একজন বলছেন কন্দর্সের মৃত্যু ঘটেছে ১৭৯৪ সালে কারাগারে, অপরের মতে তাঁর মৃত্যুসাল ১৭৯৯, এবং ১৭৯৪ যে ছাপার ভুল তা মনে করবার কারণ নেই, কারণ তখন রামমোহনের বয়স যে ২২ বৎসর তাও উল্লেখ করেছেন হীরেনবাবু। মনে হয়, রামমোহন-কন্দর্সের যোগাযোগের প্রসঙ্গটি উভয়েই গ্রহণ করেছেন কে. এম. পাণিক্করের বই থেকে। বইটির নামও দুই প্রবন্ধে একটু পৃথক। আবার ভিক্তর জাক্‌মঁ বা জাকমোঁকে লেখা চিঠি নিয়েও দুই নিবন্ধে তারিখের ফারাক এক বছর। সম্পাদনায় অধিকতর যত্ন থাকলে পাঠকের সংশয়নিরসন হতে পারত। হয়তো বা একই বিষয়ে দুই প্রবন্ধের প্রয়োজনই দেখা দিত না। প্রায়ই একই কথা বলা যায় শ্রীরেণু চক্রবর্তী এবং শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের প্রবন্ধ দুটি প্রসঙ্গে। শ্রীরেণু চক্রবর্তীর প্রবন্ধের পর শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের ইংরেজি-রচনার তর্জমা খুব কি জরুরি ছিল? সুপরিকল্পনার অভাবে গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা অনাবশ্যকভাবেই বেড়ে গেছে। পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বাইরে তিনটি ক্ষুদ্র

প্রবন্ধের উল্লেখ করতেই হয়—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের "রামমোহনের গান", হজরীপ্রসাদ দ্বিবেদীর "হিন্দী ভাষায় রামমোহন" রায় এবং শ্রীনির্মল দাশের "বৈয়াকরণ রামমোহন রায়"—এর মধ্যে দ্বিতীয়টি পূর্বে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের তর্জমা। প্রবন্ধ তিনটিতে ধর্ম, সমাজ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের বাইরে রামমোহনের কয়েকটি বিশিষ্টতার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। অপর দুই অবশ্য-উল্লেখ্য প্রবন্ধ শ্রীঅমলেন্দু দে-র "নবচেতনার দুই অগ্রপথিক : দারা শিকোহ ও রামমোহন রায়" এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার দাশগুপ্তের "আধুনিক যুগ, সংবাদপত্র ও রামমোহন"। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ, তবে তার অন্তিম সিদ্ধান্ত 'এ মানুষটি [রামমোহন রায়] যদি ধর্ম আন্দোলনে ব্রতী না হতেন, যদি সতীদাহপ্রথা নিরোধের জন্য চেষ্টা নাও চালাতেন, যদি ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের জন্যও চেষ্টা না করতেন—তবু কেবল সংবাদপত্রের কারণেই তিনি এদেশে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।'—বৈজ্ঞানিকবিশ্লেষণধর্মী উক্তি নয় বোধহয়। অমলেন্দুবাবুর প্রবন্ধের বিষয় থেকে মনে পড়ে যায় আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে এই কলকাতা শহরে "দারাশিকোহ-রামমোহন"-এর নাম সংবলিত এক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল প্রধানত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রাবউদ্দিন আহমদের উৎসাহ এবং আগ্রহে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘজীবী হয় নি, তবে প্রসঙ্গটি যে এখনও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি অমলেন্দুবাবুর প্রবন্ধ তা মনে করিয়ে দিল।

সংকলনগ্রন্থের সবচেয়ে জরুরি প্রবন্ধ অর্থনীতিবিদ শ্রীভবতোষ দত্তের "রাজা রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি" এবং চিন্মোহন সেহানবীশের "ব্রাহ্ম আন্দোলন ও ভারতের শ্রমজীবী সমাজ"—সম্প্রতিকালে কোনো-কোনো গবেষকমহলে যে রামমোহন-পুনর্মূল্যায়নের অজুহাতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করার প্রয়াস চলছে, প্রবন্ধ দুটি তারই সমুচিত জবাব। শ্রীভবতোষ দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধটির পরিপূরক প্রকাশনা হিসেবে "রামমোহন ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ" পুস্তিকাটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ এবং শ্রীমঞ্জুলা বসুর মূল নিবন্ধের উপসংহারে ভারতবর্ষীয় রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধীয় এবং ভারতীয় রাজস্বপদ্ধতি সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের দুটি নিবন্ধ এবং শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস-কর্তৃক সংগৃহীত রায়তদের অধিকার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রামমোহনের একটি নোট সংযোজিত হয়েছে। শ্রীভবতোষ দত্তের নিবন্ধটি এবং "রামমোহন ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ" পুস্তিকাটি রামমোহনচর্চার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন বলে স্বীকৃতি পাবে সন্দেহ নেই।

সংকলনগ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীগৌতম নিয়োগী যে 'অত্যন্ত অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থপঞ্জী ও রামমোহন-বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাবলীর বিষয় দীর্ঘদিন তথ্যসংগ্রহ' করছেন, তার 'সংক্ষিপ্তসার' মুদ্রিত হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পালের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত *Studies in the Bengal Renaissance* গ্রন্থে জ্ঞানাঞ্জন পাল বিপিনচন্দ্র পালের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছিলেন, আর বিপিনচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেছিলেন পুলিনবিহারী সেন। বর্তমান সংকলনগ্রন্থে রামমোহনের জীবনী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পাদকমণ্ডলী অনুভব করেন নি। সম্প্রতি ইংরেজিতে কলেটের জীবনীগ্রন্থ এবং বাঙলায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো সে কারণেই রামমোহনের কোনো জীবনী এই সংকলনগ্রন্থে স্থান পায় নি। কিন্তু পুলিনবিহারী সেন-কৃত বিপিনচন্দ্র পালের গ্রন্থসূচীর তুলনায় শ্রীগৌতম নিয়োগীর গ্রন্থসূচী খুবই দুর্বল মনে হতে পারে। বিশেষত রামমোহনের গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রকাশস্থান এবং সাল ব্যতীত কোনো তথ্যই সান্নিবেশিত হয় নি আর রামমোহন-বিষয়ক গ্রন্থের বিবরণ তো আরও ত্রুটিযুক্ত। বহু ক্ষেত্রে প্রকাশসালও উল্লেখ

করা হয় নি। কোনো-কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেরও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে গ্রন্থসূচীর মর্যাদা বাড়ে না, যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্যসাধক চরিতমালার গ্রন্থটির উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৭ পুনর্মুদ্রণের সূত্রে, যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৭টি রামমোহন-বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কবে যে বাংলাভাষায় পুলিনবিহারী সেন প্রমুখের আদর্শে যোগ্য গ্রন্থসূচী প্রণয়নের যথাযোগ্য উদ্‌যোগ শুরু হবে!

'ভূমিকা'য় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছিলেন 'আজকাল তরুণ বিদ্যার্থীদের কাছে রামমোহনের যুগটা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের মতোই অপরিচিত ও দুর্বোধ্য।' যদিও পরবর্তী কালে জিজ্ঞাসুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রভাতকুমার আশান্বিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রশ্ন সেই আশার বশবর্তী হয়েই কি সম্পাদকমণ্ডলী 'অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য'—এই পাণ্ডুলিপিচিত্রটির কোনো প্রসঙ্গপরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না? ধরেই নিলেন রবীন্দ্রনাথ কবে কোথায় কেন এমন একটা 'অটোগ্রাফখাতা'য় মন্তব্য করেছিলেন তা বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ পাঠকেরই জানা আছে। যদি তা থাকে তবে তো খুবই আশার কথা। তবে বাঙলা ভাষায় সম্পাদনা বা গ্রন্থপ্রকাশের আদর্শ যে পথে নেমে চলেছে, তাতে আমরা কিঞ্চিৎ শঙ্কাবোধ করছি।

রামমোহন রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-কথা

গৌতম নিয়োগী

অবশেষে ইংরেজী ভাষায় লেখা রাজা রামমোহন রায়ের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক জীবন-চরিতটি ছাব্বিশ বছর পর পুনরায় ছাপা হল। এটি নিঃসন্দেহে গত এক বছরের কলকাতার প্রকাশনা-জগতের অন্যতম আনন্দ-সংবাদ। যেহেতু ইতিহাসানুরাগী যে-কোনো ভারতীয় আধুনিক-মনস্ক মানুষকে আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়তেই হয়, এবং যেহেতু ভারতে আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), তাই রামমোহনের জীবন এবং কর্মকাণ্ডও অবশ্য-পাঠ্য। আবার যেহেতু রামমোহনের ভূমিকা ভারত-ইতিহাসের এক তাৎপর্যময় যুগসন্ধিক্ষণে একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে কোনো-কোনো ব্যাপারে বিতর্কিত, সুতরাং নির্মোহ-নিরপেক্ষ পাঠককে অনুসন্ধান করতে হয় সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক জীবনীর। ঠিক এই কারণেই ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজ লেখিকা কুমারী সফায়া ডবসন কলেট (২. ২. ১৮২২-২৭. ৩. ১৮৯৪)-কর্তৃক লিখিত রামমোহনজীবনীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, তখন কয়েক বছরের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। ইতোমধ্যে সাধারণভাবে আধুনিক ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয় এবং ১৯৭২ সালে রাজা রামমোহনের জন্মদ্বিশতবর্ষ উৎসবের পর থেকে বিশেষভাবে রামমোহন সম্পর্কে সাধারণ্যে অনুরাগ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। উত্থাপিত হয় নতুন-পুরানো বিতর্ক, অথচ চাহিদা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও কলেটের জীবনী-গ্রন্থটি অমুদ্রিতই থাকে। তাই আজ যখন বহুবিধ অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য-সমন্বিত পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুষঙ্গ সহ চতুর্থ সংস্করণটি বর্তমান বিশ্বের সর্বাগ্রগণ্য রামমোহন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হতে দেখি, তখন আহ্লাদিত হবার যথার্থই কারণ ঘটে।

The Life and Letters of Raja Rammohan Roy by Sophia Dobson Collet. Ed. by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguly. Sadharan Brahmo Samaj, 4th edn., Calcutta, 1988. Price Rs. 75.

কুমারী কলেটের বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল লনডন থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন লেখিকা বেঁচে নেই (সাফায়া ডবসন কলেটের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই, তবে এ-বিষয়ে দ্র. গৌতম নিয়োগী, "তুমি ছিলে সিন্ধুপারে, ওগো বিদেশিনী", "দেশ", শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ)। বস্তুতপক্ষে বইটির অনেকটা অংশ তিনি নিজে লিখেই যেতে পারেন নি। মৃত্যুপথযাত্রিণী লেখিকার অনুরোধে তা শেষ করেছিলেন এক ইংরেজ ধর্মযাজক, যাঁর নাম তখনো—এমনকি আরো বহুদিন পর্যন্ত—অজ্ঞাত ছিল। জানা গেল কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ অনুচর প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র ব্যারিস্টার প্রশান্তকুমার সেনকে (ইনি ছিলেন বিখ্যাত আইনজ্ঞ, একদা পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি, ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর সাংবিধানিক সভার ও পরে সংসদের সদস্য) লেখা ক্লারা কলেটের ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর তারিখের চিঠিতে। প্রশান্তকুমার জানতে চেয়েছিলেন: কলেটের বইয়ে যে, 'সংযোজনকারী' (continuator) আত্মপরিচয় গোপন করেছিলেন, তাঁর পরিচয় জানা আছে কি না। জবাবে, ১৩ সাউথ হিল পার্ক গার্ডেনস্, হ্যামপস্টেড থেকে কুমারী কলেটের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী ক্লারা জানান যে: 'The 'continuator' of my aunt's "*Life and Letters of Raja Rammohan Roy*" was the late Rev. F. Herbert Stead, who was for several years a congregationalist minister at Leicester, then editor of the *Independent and Nonconformist* (1890-92), and shortly after my aunt's death in March, 1894, the warden of the Robert Browning Settlement at Walworth'. (চিঠিটির পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে, প্রশান্তকুমার সেন, **বায়োগ্রাফি অব এ নিউ ফেথ্**, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ ৩৫৩-৩৫৪)।

নিজের জীবনের 'হীরো' রামমোহন রায়ের জীবনী-লেখা ছিল কুমারী কলেটের কাছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং এই তীব্র বাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর স্বচ্ছ ইতিহাসবোধ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে সারাজীবনে বিপুল তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন; কোনো প্রতিকূলতা, এমনকী শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্পৃহা দমন করতে পারে নি। প্রতিটি তথ্য খুঁটিয়ে যাচাই করতেন। রামমোহন এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতৃবর্গের প্রতিটি গ্রন্থ, ব্রাহ্মসমাজের নানা পত্র-পত্রিকা, ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইত্যাদি যেমন ইংল্যানডে বসে ডাক মারফত সংগ্রহ করতেন, তেমনি কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, রাখালদাস হালদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যে-যখন বিলেত গেছেন তাঁর সঙ্গেই আলোচনায় বসতেন আর প্রতিনিয়ত চিঠি লিখতেন বাঙলাদেশে নানা ব্যক্তিকে। বাঙলা পর্যন্ত শিখেছিলেন (দ্র. একটি চিঠিতে যেখানে তিনি সোফিয়া না লিখে 'সফায়া ডবসন কলেট' বানানে নাম সই করেছেন। গৌতম নিয়োগী, 'কুমারী কলেট লিখিত একখানি বাঙ্গালা পত্র', তত্ত্ব কৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এখানে নেই, শুধু উল্লেখ করতে চাই রামমোহনের জীবনী এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার বাসনায় তাঁর সংগৃহীত মাল-মশলা ছিল বিশাল। প্রথম কাজটি তিনি শুরু করেন। বইটি পরিকল্পনা করেন আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে, কিন্তু কাজ অনেকটা এগিয়ে অসমর্থ হওয়াতে হার্বার্ট স্টেডকে অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধও করুণ: 'I am dying. I cannot finish my "Life of Rammohan Roy." But when I enter the unseen, I want to be able to tell Rammohan that his 'Life' will be finished. Will you finish it for me?' এই আকুল অন্তিম আহ্বানে সাড়া দিয়ে

স্বেচ্ছাক্রমে প্রণোদিত হন স্টেড। কলেটের মতো তাঁর প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কলেটের যতখানি লেখা হয়েছিল, তার পর অনেকটা স্টেড লিখে কলেটকে শুনিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেন। বর্তমান সংস্করণে সম্পাদকদ্বয় কোন্ অধ্যায়ে পর্যন্ত কলেটের নিজের বা অনুমোদিত, কতখানিই বা স্টেড লিখেছেন, তা ভূমিকায় যদিও আলাদা করে জানান নি, তবে এই সম্পাদকদ্বয় তৃতীয় সংস্করণে (১৯৬২) তা জানিয়েছিলেন। পরের অনুচ্ছেদেই সে-প্রসঙ্গে আসব। পূর্বোক্ত চিঠিতে ক্লারা কলেট লিখেছেন: 'Having satisfied himself of the intrinsic greatness of Rammohan Roy, Mr. Stead simply set himself to work as the amenuensis of the historian, using his journalistic experience and skill in cutting down and selecting his material. The last pages (প্রথম সংস্করণ, লনডন, ১৯০০, পৃ ১৪৮-১৫৭, বর্তমান সং, পৃ ৩৪২-৩৫১) are admittedly Mr. Stead's own summary of the impressionl eft on him at the end of his survey of the life and charaeter of his subject'. দুজনের হাত থাকা সত্ত্বেও বইটি কলেটের নামে সঙ্গত কারণেই প্রকাশিত হয়, কারণ সংযোজনকারী আর অনুলেখক স্টেড নিজেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন: 'But the work in conception, outline, material and in all but execution is and remains Miss Collet's (দ্রষ্টব্য Continuator's Note, বর্তমান সং, পৃ XV)।

সফায়া ডবসন কলেটের রামমোহন-জীবনীর মোট আটটি অধ্যায়। এই জীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লনডন থেকে, সে-তথ্য আগেই জানিয়েছি। বইটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছেপেছিলেন হ্যারল্ড কলেট; বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬৪। বইটিকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত দেখতে পাই, স্বতন্ত্র চিহ্ন দিয়ে হার্বার্ট স্টেড সে ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছেন। প্রথম অংশ (বর্তমান সং, পৃ ১-১৩১) কুমারী কলেটের স্বহস্তে লিখিত; দ্বিতীয় অংশ (১৩১-১৮৫) সংযোজনকারীর লেখা এবং কলেটের শুনে-শুনে সংশোধন-কৃত এবং শেষ অংশ (পৃ ১৮৫-৩৫২) একান্তই সংযোজনকারীর কলম থেকে উৎসারিত। মূল সংস্করণে লেখিকা ও সংযোজনকারী বহু পাদটীকা ব্যবহার করেছিলেন, যা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না কিংবা অসম্পূর্ণ ছিল। য়োরোপে এবং ভারতে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পরে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম ভারতীয় সং) প্রকাশ করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রচারক হেমচন্দ্র সরকার (নদীয়া জেলার সন্তান হেমচন্দ্র ইংরিজি সাহিত্যের এম. এ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় ইনি ১৮৯৭ ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকব্রত গ্রহণ করেন, কিছুকাল পাটনার রামমোহন সেমিনারিতে শিক্ষকতা করেন; অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানচেস্টার কলেজের ফেলো ছিলেন এবং বাঙলা ও ইংরাজিতে একাধিক সুলিখিত গ্রন্থের রচয়িতা)। নূতন সংস্করণে সম্পাদক মূলপাঠের কিছু ভুলত্রুটি সংশোধন করেন এবং কুমারী কলেটের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক রচনা ও রামমোহন রায়ের কিছু পত্র সংযোজন করেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি কয়েক বছরের মধ্যেই ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বহু বছর কলেটের রামমোহন-জীবনীর কোনো পুনর্মুদ্রণ হয় নি। ইতোমধ্যে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে কলকাতায় ভারতের অন্যত্র তথা পৃথিবীর নানাস্থানে পালিত হয় এবং রামমোহনচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে (এ বিষয়ে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, **দ্য ফাদার অফ মডার্ন ইণ্ডিয়া: কমেমোরেশন ভল্যুম অব রামমোহন রায়**

সেনটেনারি সেলিব্রেশনস্, কলকাতা, ১৯৩৫ গ্রন্থে)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, যোগানন্দ দাস প্রমুখ গবেষকদের প্রচেষ্টায় বহু নতুন তথ্য এবং অজানা আকর-উপাদান ইত্যাদি আবিষ্কৃত হতে থাকে। এই নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং নবাবিষ্কৃত মালমশলার আলোকে রামমোহনের নব-মূল্যায়নপ্রচেষ্টার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশের দশকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যানির্বাহক সমিতির সানুগ্রহ সহযোগিতায় ও সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে কলেটের রামমোহন-জীবনীর নূতন সংস্করণের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন প্রয়াত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস।

উভয়েই রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে সুপরিচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্রষ্টা প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তদীয় পত্নী ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটদ্বয়ের অন্যতমা ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতচন্দ্র সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে যশস্বী ছিলেন। আজীবন তিনি রামমোহনচর্চায় নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন; যার সাক্ষ্য বহন করছে "রামমোহন-প্রসঙ্গ", "আত্মীয়সভার কথা", "ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া", "বাঙলার নারীজাগরণ" ইত্যাদি গ্রন্থ। বিশেষত একশ্রেণীর একদেশদর্শী রামমোহন-বিদ্বেষী তথাকথিত গবেষকগণের অনৈতিহাসিক এবং সাম্প্রদায়িক রচনায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রামমোহনকে খাটো করার বা অকারণ কুৎসার যোগ্য জবাব দিয়েছেন প্রভাতচন্দ্র, অনেকবার। দিলীপকুমার বিশ্বাস পেশায় ইতিহাসের গবেষক এবং অধ্যাপক। তাঁর প্রাণের বিষয় রামমোহন রায়। যাঁর জীবন আর কর্ম দিয়ে গবেষণায় তিনি নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সময়, তাঁর সবটুকু মেধা আর শক্তি এবং তাঁর অখণ্ড, অবিচল অভিনিবেশ রামমোহন রায়ের প্রতি উৎসর্গীকৃত হওয়ার ফলেই আমরা পেয়েছি রামমোহন রায়ের জীবন সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য আর বিশ্লেষণ, বহু উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এবং "রামমোহন-সমীক্ষা"র মতো গ্রন্থ, যা রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত। বিশেষত পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে রামমোহনের নিজের লেখা কিংবা রামমোহন সম্বন্ধে লেখা নানা সমসাময়িক দলিল উদ্ধারে অধ্যাপক বিশ্বাসের কৃতিত্ব অনন্য। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলেটের রামমোহন-জীবনীর তৃতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশ করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখনই তা হয়ে উঠল, রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-কথা। মূল সংস্করণ বা হেমচন্দ্র সরকার -সম্পাদিত সংস্করণের তুলনায় কলেবর বৃদ্ধি পেল দ্বিগুণের বেশি। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মণীন্দ্রকুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রকাশন উপসমিতির সম্পাদক মুদ্রণ- ও প্রকাশনা-জগতে প্রবাদপ্রতিম প্রয়াত রবীন্দ্রচর্চাবিশারদ পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত ওই গ্রন্থে ৪ পেজি ফর্মায় প্রায় ৭১ ফর্মায় মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬২। এতেই বোঝা যায়, সম্পাদকীয় কৃত্য কতদূর পরিমাণ বহুমুখী, পর্যাপ্ত এবং অনুপুঙ্খবহুল। কলেটের মূল পাঠ অপরিবর্তিত রেখে পাদটীকাগুলি সাবধানে পরীক্ষা করে ভ্রম-সংশোধন, স্থানে-স্থানে পৃষ্ঠার রেফারেন্স যোগ করা, প্রয়োজনে মূল পাদটীকার সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে আলাদা বাড়তি মন্তব্য- ও তথ্য-সংযোগ, প্রভূত পরিমাণ নতুন পাদটীকা সংযোগ, এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই বিতর্কিত বা সবিস্তার আলোচনাযোগ্য বিষয়গুলি নিয়ে প্রাসঙ্গিক পর্যাপ্ত আলোচনা করা প্রভৃতির ফলে গ্রন্থটি আধুনিক পাঠকদের যুগোপযোগী যেমন হয়ে ওঠে, তেমনি গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় বহুল পরিমাণে। নটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে নতুন পরিশিষ্ট যুক্ত হয়ে ষোলোটি চিত্র শোভিত হয়ে বইটি আরো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উৎকৃষ্ট ছাপা এবং অঙ্গসজ্জা তো ছিলই।

উচ্চাঙ্গের এই গ্রন্থটির চাহিদা রামমোহনানুরাগী পাঠকমহলে এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাসে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছিল বিপুল, সুতরাং এই সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এবং যেহেতু রামমোহন বিষয়ে অনেক নতুন বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে ১৯৬২-র পরে এবং আবিষ্কৃত হয়েছে বহু নতুন তথ্য, সুতরাং এই সর্বতোভদ্র গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ ছিল জরুরি কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত এই সংস্করণের কাজ শুরু হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই অন্যতম সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন (৭ মার্চ, ১৯৬৩)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুই ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও আপনজন যাঁরা এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই ডা. দেবপ্রসাদ মিত্র ও পুলিনবিহারী সেনও আজ নেই। তবু অধ্যাপক বিশ্বাসের একক চেষ্টাতেই গ্রন্থটি যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে, সে-কথা বর্তমান সমালোচক সানন্দে স্বীকার করেন। আগে বহুবার পঠিত গ্রন্থটিতে নতুন সংস্করণ পাঠ করে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল—আমার চোখের সামনে ভাসে উনিশ শতকের কলকাতা, রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের নানা সভা, আদর্শ, ব্যস্ততা, নানা পরিকল্পনা ও বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড, সেই পুরানো যুগে জাহাজে নীলদরিয়ায় রাত্রিবাস, দেশের মানুষজন আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এক বড়ো মাপের মানুষের সুদূর বিদেশে একাকী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ—সব মিলে এক পরিষ্কার ছবি। মধ্যবয়সে এই অভিজ্ঞতা খুবই স্মরণীয় ও প্রীতিকর।

বর্তমান সংস্করণে প্রতিটি সম্পাদকীয় টীকা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা সংশোধিত হয়েছে, কোনো-কোনোটি সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যেসব সম্পাদকীয় অতিরিক্ত টিপ্পনী আছে, তৃতীয় সংস্করণে তার স্বতন্ত্র শিরোনাম ছিল না; কিন্তু এই সংস্করণে আলাদা-আলাদা হেডিং যুক্ত হয়েছে। কলেটের প্রথম অধ্যায়ের নাম: সত্যের সন্ধানে (Searching for Truth) এবং রামমোহনের জীবনের প্রথম পর্ব (১৭৭২-১৮০৩) এখানে বর্ণিত। রামমোহনের জন্ম সম্ভবত ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মে। সম্ভবত কেননা ১৭৭২ না ১৭৭৪ এ-নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট তর্ক হয়েছে তবু কলেট কিন্তু পারিবারিক সূত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে আগেই ১৭৭২কেই বেছে নিয়েছেন। শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক খুঁটিনাটি ছাড়া এই ধরনের বিতর্ক বরাবরই আমার অর্থহীন মনে হয়েছে, হয়তো কবি এই ধরনের তর্কেরই বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করেছেন যে কালিদাসের কাল কবে চলে গেছে, এখনো 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে নিয়ে তারিখ সাল'। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী কয়েক বছর আগে বিস্তারিত আলোচনা করে ১৭৭২ কেন অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা দেখিয়েছেন। (দ্র. "রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবকাল", "কালি ও কলম", বৈশাখ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪১৯-৩৫)। দিলীপকুমার বিশ্বাস এই বিষয়ে রামমোহন রায়ের জন্মদিন ও বংসর বিষয়ে সম্পূর্ণ দীর্ঘ টীকা সঙ্গত কারণে যুক্ত করেছেন (পৃ ৯-১৫), যাতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন যুক্ত করেছেন: রামমোহনের বংশ-পরিচয় সমন্বিত 'রায়-পরিবারে কুলজী' (পৃ ১৬-২১)। এই নতুন টীকাটিরও প্রয়োজন ছিল, কেননা রামমোহনের দুই উত্তরপুরুষ নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় (রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের কন্যা চন্দ্রজ্যোতি ও তাঁর স্বামী শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র) এবং মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি (রামমোহনের পিতামহের অর্থাৎ ব্রজবিনোদ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামকিশোর—যিনি রামমোহনের জ্যেঠামশাই—তাঁর পুত্রের পুত্র) পূর্বপুরুষদের কিছু-কিছু ইতিহাস বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া সম্পাদকমশাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন আরো কিছু ব্যক্তি বা বিষয়, যেমন পিতামহ ব্রজবিনোদ রায়, রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ, রামমোহনের উত্তরভারত ও বেনারসে বসবাস এবং পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময় রামমোহনের উপস্থিতির

বিষয়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পংক্তিতেই কলেট যে লিখেছেন 'Rammohan Roy was born in the village of Radhanagar, near Krishnanagar, in the zilla of Hugli' সেখানে পাদটীকায় জানানো উচিত ছিল যে কৃষ্ণনগর খানাকুলের অন্তর্গত এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এটি হুগলি জেলায় ছিল না, ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুমারী কলেট আলোচনা করেছেন রামমোহনের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব (১৮০৩-১৮১৪); যার বিষয়বস্তু লেখকার ভাষায় 'throwing down the Gauntlet'। এই ইংরিজি বাক্যাংশটির অর্থ নিজ হাতের লৌহ-দস্তানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। ভারি সুন্দর উপমা। গভীর অর্থবহ। অর্থাৎ এই সময়-পরিধির মধ্যেই আমরা দেখি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও নানা ধর্ম-শাস্ত্রানুশীলন করা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ এবং গোঁড়া রক্ষণশীল ও পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মকে ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বে আহ্বানের সূচনা। আগের অধ্যায়ের মতো, এখানেও কলেটের কিছু-কিছু ভ্রান্তি সম্পাদকদ্বয় দূর করেছেন, যেমন: জন ডিগবির রঙপুরে অবস্থানের সঠিক তারিখ নির্ণয়, বা ডিগবির রঙপুরে যাওয়ার পূর্বে রামগড়ে অবস্থানের তারিখ নির্ণয় ইত্যাদি বা গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য লিখিত বই যে জ্ঞানচন্দ্রিকা নয়, জ্ঞানাঞ্জন বা রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর বছর ১৮১১ নয়, ১৮১২ ইত্যাদি। এগুলির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য রামমোহনের কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের তারিখ নির্ণয়। কলেট বলেছেন ১৮১৪ (পৃ ২৮, ৪০) এবং এক সময় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা মেনে নিয়েছিলেন (দ্র. "রামমোহন রায়", সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, নং ১৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৪ সং, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৫)। এখন অবশ্য অন্যান্য সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে এই কলকাতায় বাস যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে তা প্রমাণিত। তেমনি রামমোহনের চাকরি নিয়েও বহু ভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা এখনও বহু লেখকের দূর হয় নি, সম্পাদকীয় টীকাগুলি সে ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের বিচারালয়ের কর্মী টমাস উডরফের ব্যক্তিগত মুনসি হিসেবে রামমোহন মুর্শিদাবাদ যান এবং সেখান থেকে তার আরবি ভূমিকা সমেত সুবিখ্যাত ফারসি পুস্তিকা 'তুহফাৎ উল মুওয়াহিদিন' প্রকাশিত হয়। কলেট লিখেছেন: 'The treatise is important as the earliest available expression of his mind, and showing his eagerness to bear witness against established error, but it is too immature to be worth reproducing as a whole' আমার এই মূল্যায়নে আদৌ সায় নেই, 'তুহফাৎ'কে 'অপরিণত রচনা' বলা খুবই অন্যায়। হ্যাঁ, পরবর্তী কালে রামমোহন 'তুহফাৎ'-এর যুক্তিধর্মিতা থেকে অনেকটা সরে এসে যুক্তি, শাস্ত্রপ্রামাণ্য এবং সাধারণ বুদ্ধির মিশ্রণের উপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও। বরং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (দ্র "রামমোহন রায়: দ্যুইউনির্ভাসাল ম্যান", সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, পৃ ৯১০), কাজী আবদুল ওদুদ ("তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন", তত্ত্বকৌমুদী, ৭৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৃ ৬৭-৭০) এবং নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় (দ্র: সম্প্রতি প্রকাশিত রামমোহন-স্মরণ, কলকাতা, ১৯৮৯ গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁর "রামমোহন রায়ের 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন': ঐতিহাসিক ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা", পৃ ২-১৯) অনেক সঠিক। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন জন ডিগবীর অধীনে কাজ নেন প্রথমে ব্যক্তিগত মুনসি হিসেবে এবং তারপর ১৮১৫ পর্যন্ত রামমোহন নানা স্থানে কাজের মধ্যে অতি অল্প সময়ই 'সরকারি' পদে ছিলেন। সম্পাদকের সংযোজিত দ্বিতীয় টীকাটি এই প্রসঙ্গে মূল্যবান (পৃ ৪৫-৫০)। অধ্যাপক বিশ্বাস আরো একটি অতীব মূল্যবান টীকা যুক্ত করেছেন এই অধ্যায়ে

যাতে ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে রামমোহনের মামলার বিশদ বিবরণ আমরা জানতে পারি (পৃ ৫১-৬৪)। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থে প্রথম যুক্ত দশম পরিশিষ্টটির (পৃ ৪৬৯-৯২) দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ওই মামলায় বিবাদী রামমোহনের জবাব এখানে পাওয়া যায় যা বহু বছর আগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৩ বঙ্গাব্দে) "শনিবারের চিঠি" পত্রে ছেপেছিলেন, অবশ্য 'রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল' শিরোনামে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃ ৩৫) কলেট এক জায়গায় লেবার্ডের "হিস্টরি অব দ্য ব্রাহ্মসমাজ" গ্রন্থের অংশ উদ্ধার করেছেন, সম্পাদকগণের তা পত্রাঙ্ক পাদটীকায় উল্লেখ করা উচিত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে কলেটের আলোচ্য রামমোহনের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব (১৮১৫ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ)। গুরুত্বপূর্ণ, কেন না রামমোহনের মনের জাম আগেই তৈরি হলেও, তাঁর কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের পরে সংস্কারকরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার একাধারে রামমোহনের পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ তিনি, আমরা সবাই জানি, ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক কোনো বিষয়েই অনাগ্রহী ছিলেন না। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কলকাতায় "আত্মীয়সভা" স্থাপন এবং "বেদান্তগ্রন্থ" প্রকাশ। পরের বছর "বেদান্তসার" একাধারে বাঙলা, ইংরিজি ও হিন্দুস্থানিতে প্রকাশ। একইভাবে সংস্কৃত থেকে একে একে তলবকারোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ মুণ্ডকোপনিষৎ এবং শঙ্করাচার্যের 'আত্মানাত্মবিবেক' অনুবাদ প্রকাশ-বাঙলায় এবং কতকগুলি অন্যভাষায়। (বিস্তারিত দ্র. গৌতম নিয়োগী, "রামমোহন রায়ের গ্রন্থসূচী", "রামমোহন-স্মরণ", পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট, পৃ ৪৭-৫৩)। আর বিপুল উদ্যমে নানা সমাজসংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রামমোহন, যার মধ্যে প্রধানতম অবশ্যই সতীদাহ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বেরুল 'সহমরণ বিষয়ে 'প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ'; পরের বছরই 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তক দ্বিতীয় সম্বাদ'। দুটিই ইংরিজি করলেন এবং প্রকাশ করলেন। এই নানা কাজে ব্যস্ততা, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সামান্য শুভানুধ্যায়ীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী, রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজের সমালোচনায়, কুৎসায় এবং ভীতিপ্রদর্শনে অদমিত মানুষটির চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে কুমারী সফায়া ডবসন কলেটের কলমে। এইসঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (এই গ্রন্থটি রামমোহনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাঙলা জীবনী। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৮৮০। পরিমার্জিত ও সংশোধিত, পঞ্চম সং, ইনডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯২৮। তবে বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথের বইয়ের ১৯২৮ সংস্করণকে 'সর্বশেষ' (latest) লিখেছেন সম্পাদকদ্বয় (পৃ ৪১), এই তথ্য ঠিক নয়। "জীবনচরিত"-এর সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন কলকাতার দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭২ খ্রী.)। 'রামমোহনের কলকাতার বাড়িগুলি', 'রামমোহন ও বেদান্ত', 'হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী', 'রামমোহন রায় ও সতীদাহ' ইত্যাদি টীকাগুলি সুলিখিত ছিলই, এবারে সংশোধিত হয়েছে। তবে আলাদাভাবে বলার দাবি রাখে 'হিন্দু কলেজ' শীর্ষক আলোচনাটি। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের নির্বোধ অনৈতিহাসিক মন্তব্য: ওই কলেজ 'Conceived by the orthodox Hindus, established by the orthodox Hindus, for the orthodox Hindus' (দ্র. অন রামমোহন রায়, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ ৩৯) যে সত্য ঘটনার সহস্র হাত দূরে, তা সুন্দরভাবে প্রমাণিত। এজন্য আমরা দিলীপকুমার বিশ্বাসের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। প্রসঙ্গত সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, রমেশচন্দ্র মজুমদার চিরকালই জঘন্য ধরনের মুসলমান-

বিরোধিতার জন্য সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক হিসেবে কুখ্যাত, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কার না করে, এমনকী প্রাপ্ত তথ্যাদির পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করে, রামমোহন বিদ্বেষ-প্রসূত অপচেষ্টা—যার গালভরা নাম তিনি দিয়েছিলেন Rammohan-Myth খণ্ডন, আসলে ইতিহাসের চূড়ান্ত বিকৃতি বা ভীমরতি ছাড়া আর কিছু নয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারী কলেটের আলোচনার বিষয়-ত্রিদ্বৈবাদী খ্রীষ্টান মিশনারি সম্প্রদায়ের সঙ্গে রামমোহন রায়ের বহুল-জ্ঞাত বাদানুবাদ (১৮২০-১৮২৪ খ্রী)। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ধ্রুপদী ভাষার মতো রামমোহন হিব্রু, লাটিন ভাষায়ও পারঙ্গম ছিলেন এবং ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মতো খ্রীষ্টধর্ম তত্ত্বানুশীলনে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর বিশ্লেষণের পরিচয় রামমোহন-মনীষার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness; extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the Four Evangelists পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, এবং ওই বছরই An Appeal to the Christian Public পুস্তকাটি পূর্বোক্ত পুস্তকার সমর্থনে প্রকাশ করার পর বিতর্ক শুরু হয় শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে; বেশ কয়েক বছর চলার পর তার সমাপ্তি। শুধুমাত্র ব্যাপারটি মিশনারিদের সঙ্গে নয়, কলকাতার বিশপ টমাস ফ্যানল মিডলটন, স্কটিশ চার্চের ডা. ব্রাইস, রামমোহনের বন্ধু একেশ্বরবাদী ধর্মযাজক উইলিয়ম অ্যাডাম, প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক; ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ইউনটোরিয়ান কমিটি' গঠন সমস্তই যথোচিতভাবে কলেট আলোচনা করেছেন। সম্পাদকদ্বয়ের সংযোজিত এই অধ্যায়ের প্রথম টীকাটি (পৃ ১৫৮-১৬৪) তা বুঝতে আমাদের আরো সাহায্য করে। অধ্যাপক বিশ্বাস বর্তমান সংস্করণে একটি নতুন টীকা সংযোজন করেছেন রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' সম্বন্ধে (পৃ ১৬৯-১৭১)। এটি বিশেষ মূল্যবান কেননা বলা প্রয়োজন যে স্কুলটি ক্যালকাটা ইউনিটোরিয়ান কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি যেমত কলেট ভেবেছিলেন। রামমোহন এটি স্থাপনা করেন এবং শুধু তাই নয়, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠারও এক বছর আগে। আরো একটি আকর্ষণীয় বিষয় এই অধ্যায়ে আছে। তা হল: নিখিল বিশ্বের সর্বত্র রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে উদারচেতা, জাতীয়তাবাদী, প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী সক্রিয়তার প্রতি রামমোহনের হার্দিক সমর্থন। কলেট অংশবিশেষ উদ্ধার করেছেন (পৃ ১৩৭) ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ অগস্ট জেমস্ সিল্ক বাকিংহামকে লেখা রামমোহনের সেই বিখ্যাত চিঠি, যেখানে রামমোহনের স্মরণীয় উক্তি: 'Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful.' সম্পাদক এই সূত্র ধরে এক প্রাসঙ্গিক টীকায় (পৃ ১৬৪-১৬৬) রামমোহনের আন্তর্জাতিক চিন্তার আরো উদাহরণ দিয়েছেন।

প্রায় একই সময়পরিধি (১৮২১-১৮২৬) পঞ্চম অধ্যায়ে, তবে আগের অধ্যায়ে যেমন প্রধান স্থান পেয়েছে খ্রীষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিতর্ক, ওই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু রামমোহনের শিক্ষামূলক ও সংবাদপত্রের প্রসার ও স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা। যদিও দুটি অধ্যায়েই উভয় বিষয় কিছু-কিছু আলোচিত। ভারতে সংবাদপত্রের প্রসারে রামমোহনের ভূমিকা সুবিদিত। ১৮২১ থেকে একবছরের মধ্যেই বাঙলা "সংবাদ কৌমুদী", ফারসি "মিরাট-উল-আখবার" এবং ইংরেজি Brahmanical Magazine প্রকাশ শুধু নয়, বাঙলা ভাষায় বাঙালি-মালিকাধীন প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন রামমোহনের বন্ধু হরচন্দ্র রায়, এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে হরচন্দ্র রায় ছিলেন রামমোহনের আত্মীয়সভার সদস্য এবং রামমোহন তাঁর 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০) গ্রন্থে হরচন্দ্রের উল্লেখ করেন, সম্ভবত হরচন্দ্রই তাঁর প্রেসে ওই গ্রন্থ ছাপিয়েছিলেন। তবে যে জন্য রামমোহনের নাম ভারতে সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল তা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের (লর্ড হেস্টিংস এবং লর্ড আর্মহার্স্টের মধ্যবর্তী অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল জন অ্যাডামস্ কর্তৃক প্রেস অর্ডিন্যান্স, ১৮২২) বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ (একাধারে Memorial to the Supreme Court, Calcutta এবং Appeal to the King-in-Council), যাকে কলেট তুলনা করেছেন অন্ধ ইংরেজ কবি জন মিল্টনের বিখ্যাত 'Areopagitica'-র সঙ্গে (পৃ ১৮০)। এই পর্বে রামমোহনের শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। এক, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ক পত্র এবং দুই, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষার বাঙলা ব্যাকরণ প্রকাশ। বহু লোকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দর্শনের অনুরাগী, আধুনিক-মনস্ক রামমোহন প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। বস্তুত রামমোহন পাশ্চাত্য তথা আধুনিক এবং ইংরিজি শিক্ষা যুগের প্রয়োজনে মনেপ্রাণে চাইলেও, দেশীয় সংস্কৃত ভাষা ও অনুশীলনের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (দ্র. দিলীপকুমার বিশ্বাস, "রামমোহন সমীক্ষা", কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৯৬-৯৯)। এই প্রসঙ্গে আমি উদ্ধার করতে চাই, ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের সেই অংশ যেখানে রামমোহন প্রতিপক্ষ মিশনারিদের উদ্দেশ্য ক'রে বলছেন': 'In consideration of the small huts in which Brahmans of learning generally reside, and the simple food, such as vegetables etc which they are accustomed to eat, and the poverty which obliges them to live upon charity, the missonary gentlemen may not, I hope; abstain from controversy from contempt of them, for truth and true religion do not always belong to wealth and power, high names and lofty places' দ্র. ছ. ইংলিশ ওয়ার্কস অব রাজা রামমোহন রায়, সম্পাদনা কালিদাস নাগ এবং দেবজ্যোতি বর্মন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৮)।

রামমোহনের ধর্মচিন্তার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অগাস্ট ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং এই বিষয়টি কুমারী কলেটের ষষ্ঠ অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য (১৮২৬-১৮২৮)। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পংক্তিতেই লেখিকার বিখ্যাত উক্তি: 'He was above all and beneath all a religious personality.' (পৃ ২১০)। বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত। সম্পাদকগণ এটি নিয়ে স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিক টীকা যদি দিতে পারতেন তাহলে ভালো হত। বিতর্কটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা সেযুগে কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে এযুগে কাজী আবদুল ওদুদ বা ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত মত প্রকাশ করেছেন রামমোহন মূলত প্রখর সমাজসচেতন পণ্ডিত মনীষী এবং সমাজসংস্কারক এবং ধর্মসংস্কার সেই সমাজপ্রীতিরই পরিপূরক অংশ। অপরপক্ষে কলেট ছাড়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অজিতকুমার চক্রবর্তী থেকে অধুনা অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস পর্যন্ত মনে করেন রামমোহনচরিত্রে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসাই মৌল উপাদান। এই বিতর্কের তুলনায় ব্রাহ্মধর্মসমাজ না ব্রহ্মসভা, কী নামে সংগঠন গোড়ায় পরিচিত ছিল, প্রয়াত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রয়াত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিতর্ক অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদকগণ টীকা সহ দৃঢ়ভাবে 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম বেছে নিয়েছেন, তা অবশ্য সমর্থনযোগ্য বলে আমি

মনে করি। এই অধ্যায়ে সুলিখিত টীকা অবশ্য রামমোহন রায় এবং উইলিয়ম অ্যাডাম প্রসঙ্গে (পৃ ২৩৮-২৪৫)।

রামমোহনের নানাবিধ সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে সবচাইতে বড়ো ব্যাপার যে সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন ও তার সাফল্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং শেষ মুহূর্তে যদিও লর্ড বেন্টিক এককভাবেই এই কৃতিত্বের অধিকারী রামমোহনের ভূমিকা অস্বীকার করার মতো মূঢ়তা যে দু-একজন লেখক দেখিয়েছেন তাদের ইতিহাসের বোধ ও অন্তরদৃষ্টির অভাব বিচারের অযোগ্য। ভাবতে কষ্ট হয় রমেশচন্দ্র মজুমদার তাদেরই একজন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের শেষপর্বই (১৮২৮-১৮৩০) কলেটের সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন এবং তার সাফল্য শুধু বেন্টিকের আইন পাশ (৪ ডিসেমবর ১৮২৯) করার মাধ্যমেই শেষ হয়নি, পুর্ণচ্ছেদ পড়ে ইংল্যাণ্ডে প্রিভি কাউনসিলের রায় বেরুনোর পরে (১৪ জুলাই ১৮৩২)। ততদিন পর্যন্ত ছিলেন রামমোহন অতন্দ্রপ্রহরী। এই রায় বেরুবার পর রামমোহন জন পয়েণ্ডারকে এক পত্রে লেখেন : As we can be no longer guilty of female murder, we now deserve every improvement, temporal and spiritual'. (পত্রখানি প্রথম উদ্ধার করেন বিনয় ঘোষ। দ্র, "বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা", কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ ২৪৬)। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ; কলেট মাল-মশলা সংগ্রহ করার সময় বহু উপাদানই অনাবিষ্কৃত ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত যে এই আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক সর্ব অর্থেই রামমোহন। বেন্টিকের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ ছিল শুধু পার্থক্যগত—রামমোহন সমাজপরিবর্তন আনয়ন করবার প্রকৃষ্টতম উপায় মনে করতেন আইনগত ব্যবস্থা নয়, লোকশিক্ষা ও চেতনার প্রসার—আইন পাশ হওয়ার পর অবশ্য রামমোহন সেই আইনের সমর্থনে অটল; আইনের আগে রামমোহন ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত আর আইন পাশের পর রক্ষণশীল প্রতিবাদের উদ্দামতায় বেন্টিক বিচলিত, বরং রামমোহনই স্থিতপ্রাজ্ঞ। নানা সমসাময়িক দলিল সেই সাক্ষ্য দেয়, দুর্ভাগ্যবশত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো প্রবীণ লেখক এ-ব্যাপারে বিদ্বজ্জনোচিত সততা কিংবা এইসব উপকরণের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় দেন নি।

কলেটের গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য রামমোহনের জীবনের শেষ পর্ব (১৮৩০-১৮৩৩) অর্থাৎ এটি কুমারী মেরী কার্পেন্টারের সুপরিচিত গ্রন্থের ("দ্য লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যাণ্ড অব দ্য রাজা রামমোহন রায়," লণ্ডন, টুব্রনার অ্যাং কোং, ১৮৬৬ শেষ সং, কলকাতা ১৯৭৬) পরিপূরক। আগেই জানিয়েছি এই অধ্যায়টির দায়িত্ব কলেটের নয়, সম্পূর্ণভাবে সংযোজনকারী হার্বার্ট স্টেডের এবং তিনি অনেক জায়গাতেই রামমোহনের মূল্যায়ন করেছেন যা সঠিক নয়, সম্পাদকদ্বয় সেগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি কিছু সমসাময়িক দলিল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রতিটি টীকাই সুলিখিত এবং আগেরগুলির মতো প্রামাণিক তথ্য-ভিত্তিক।

সফায়া ডবসন কলেটের গ্রন্থের মূল সংস্করণের সঙ্গে এই সংস্করণের বড়ো প্রভেদ হল সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক সংযোজিত অতীব মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় দলিল পঞ্জীর 'পরিশিষ্ট' হিসেবে সংযোজন। রামমোহন রায়-লিখিত এবং রামমোহন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থপঞ্জীর (নির্বাচিত) সংকলন যুক্ত ক'রে সম্পাদকগণ আরেকটি উপযুক্ত কৃত্য সম্পাদন করেছেন। কিছু-কিছু সদ্‌গ্রন্থ থাকে যা একাধিকবার পাঠ করলেও একই রকম তৃপ্তি পাওয়া যায়, কলেটের রামমোহন-জীবনীর এই প্রামাণিক সংস্করণটি সেই গোত্রের।

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চোখে ইসলামের অবদান

খাজিম আহমেদ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি, সংস্কৃতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠলেও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে অপারগ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার হদিশ তখনো পাওয়া যাচ্ছে না। ফলত, বিজ্ঞান-অনুশীলনের ক্ষেত্র অচর্চিত রয়ে গিয়েছিল। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হলেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুই বিশাল প্রতিভা—জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার উদ্ভাসন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই বিজ্ঞানমনস্কতার ফলেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিন্তাভাবনা অভিনবত্বে, স্বাতন্ত্র্যে এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আচার্য রায় প্রলোভনহীন স্বার্থত্যাগী বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শিল্পসংগঠক, দানপরায়ণ সমাজব্রতী, বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক, যদ্দর্ষি, রাজনৈতিক সন্ন্যাসী, সাহিত্যসাধক এবং সর্বোপরি 'He was a great exponent of Hindu-Moslem unity…'. (Acharya Prafulla Chandra Roy, Birth Centenary Souvenir Volume, Calcutta University, 1962, Page 23)। উনিশ শতক এবং বিশ শতকের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত এই দেশের গত দেড় শ বছরের ইতিহাসে এমন মানুষের সংখ্যা বেশি নেই। বস্তুত, বিদ্যাসাগরের পর এমন বড়ো মাপের মানুষ বাঙলার ইতিহাসে দৃশ্যমান নয়। তাঁর প্রতিভার চারণভূমি বিশাল। জ্ঞানচর্চার সাধনায়, কর্মে এবং মানবিক সত্তার সন্ধানে অতুলন এই মনীষী 'হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন।' তাঁর সাধনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে না। অবশ্য এটিও স্মর্তব্য যে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত নন। "নব্য হিন্দুবাদী"-দের আদর্শচর্চার প্রবণতা এদেশে ক্রমবর্ধমান। খুব সম্ভব এই মানসিকতা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছে। অথচ দেশ-কালের বর্তমান পটভূমিতে তিনি কোনোভাবেই অপ্রাসঙ্গিক আর অর্থহীন হয়ে যান নি।

আচার্য রায়ের দিকনির্দেশক চিন্তাভাবনা নয়া প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিলাষেই বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশ। আলোচ্য গ্রন্থটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তিনটি অসামান্য সমাবর্তন-ভাষণের সংকলন। ভাষণ তিনটি দিয়েছিলেন আলিগড় জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উদার, অসাম্প্রদায়িক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ।

কী সূত্রে তিনি অর্জন করেছিলেন মনুষ্যত্ব-চর্চার এমন উদার বোধ—সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি এবং প্রতিভা বিকাশের মূলে তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সনাতন হিন্দু পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও হরিশ্চন্দ্র ছিলেন উদারমতাবলম্বী। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন ডি. এল. রিচার্ডসন এবং বাঙলার জাগরণের অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক ব্রাহ্মপ্রচারক রামতনু লাহিড়ীর প্রত্যক্ষ সাহচর্য।' রামতনু লাহিড়ীর সংস্পর্শে হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর "আত্মচরিত"-এ পিতার সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি পারসী ভাষা জানিতেন, সংস্কৃত ও আরবীও কিছু জানিতেন। ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁহার বেশ দখল ছিল। 'সাগরদাঁড়ী সেখপাড়া নিবাসী মৌলবী মখমলের নিকট ইনি আরবী ও পার্সী পড়েন। দুর্গাপুরের সেখ হাতেম

Three Convocation Addresses of P. C. Ray. Compiler : R - K - B - K Acharya Prafulla Chandra Sammilani. Distributor : N. P. Sales (P) Ltd. Calcutta-6. Rs. 15.

মৌলবীর পিতা সেখ মাদারবক্স আখুন্জীর নিকট হরিশবাবু পার্সী পড়েন।' (A. P. C. Ray, B. C. S. Volume, পৃ ২৩৭)। মৌলবীর হাতে মুরগির মাংস খেলে 'জাত' যাবে—এই ধারণায় তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। হরিশ্চন্দ্র ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের উগ্র সমর্থক। এই কারণেই তিনি সমাজে "ম্লেচ্ছ" হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রায় সর্বতোভাবেই একজন আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। আধুনিকতার প্রতি পিতার এই অনুরাগ কালক্রমে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মানসগঠনে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই প্রভাবই তাঁকে পরবর্তী কালে সমাজসংস্কারক করে তোলে। আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। "আত্মচরিত"-এ তিনি লিখেছেন, 'কেশবচন্দ্রের নূতন সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আমি তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিতে যাইতাম। কেশবচন্দ্রের গম্ভীর ওজস্বিনী কণ্ঠস্বরের ঝংকার এখনো আমার কানে বাজিতেছে। টাউন হলে কিংবা ময়দানে বা অ্যালবার্ট হলে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ আমি কখনই ত্যাগ করিতাম না।' তিনি বলতেন, 'আমি কোনো সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি।··· আমি নিক্তির ওজন করিয়া সকলের ভালোমন্দ ওজন করিয়া বিচার করিতে চাই।' 'আমি কেমিস্ট, আমি জাত মানি না।' "জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা" নামক গ্রন্থে (১৯২০) জাতিভেদের অভিশাপ হিন্দুসমাজকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তার অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালে পুরো দেশ ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। এমন দমবন্ধ-করা পরিবেশে আচার্যের স্মরণ জরুরি হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের সূত্র সন্ধান করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা এই বন্যা সেবাকার্যের ভিতর দিয়া আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। রাজনৈতিক প্যাক্ট ও আপোস সফল না হইতে পারে, কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে, তাহার ক্ষয় নাই।'

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক মন সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি লিখেছেন, 'ইতিহাস ও জীবনচরিত আমার খুব প্রিয় ছিল।' Life and Experience of a Bengali Chemist গ্রন্থে লিখেছেন, 'History and biography have even now a fascination for me' (পৃ ২৯)। জীবনের দীর্ঘকাল তিনি ইতিহাসচর্চায় ব্যয় করেছিলেন। নির্মোহ ইতিহাসচর্চা তাঁকে বিভিন্ন সভ্যতা আর জাতিসত্তা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। "সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা" সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিযোগিতায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে যোগদান করে প্রফুল্লচন্দ্র ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জন ব্রাইট পর্যন্ত তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থে এখানেই তাঁর ইতিহাস-অনুসন্ধানের সূত্রপাত। মুসলিম ভারতীয়দের তিনি এখানে বসেই চিনেছিলেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটিতে একথা পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন আচার্য রায় (পৃ ৩৫)। প্রখর ইতিহাসচেতনা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন, 'কোন জাতির গৌরব ও মহত্ব নিরূপণ করিতে হইলে কি কি উপাদানে এই মহত্ব গঠিত সর্বাগ্রে তাহারই পর্যালোচনা করিতে হইবে।··· ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা বাঙালীর, এমন কি হিন্দু জাতির অতীত গৌরবের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করেন মাত্র।'

আলিগড়ের বিশাল ভাষণটিতে (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩) আচার্য রায় বিশ্বজনীন ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্যের ওপর আলোকপাত করেছেন। আলোচনাটির সারাৎসার অত্যন্ত সংক্ষেপে পাঠকদের সামনে পেশ করা হচ্ছে :

চিন্তার স্বাধীনতা ইসলামের বৌদ্ধিক ঐতিহ্য। এই চিন্তাচেতনার পরিণতি হিসাবে অতীতে ইসলাম ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। নিখিল বিশ্ব যখন অন্ধকারময়, তখন পুরো মধ্যযুগ জুড়ে ইসলাম জ্ঞানের মশালটি জ্বালিয়ে রেখেছিল। আচার্য রায় বলছেন যে তিনি মুসলিম নন বটে, কিন্তু এশিয়াবাসী হিসেবে বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোভার জন্য গর্বানুভব করেন। কেননা এই কেন্দ্রগুলোতে চর্চিত হয়েছিল বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এবং শিল্প-স্থাপত্যবিদ্যা। প্রাচ্য এবং গ্রীসের জ্ঞানভাণ্ডারকে ইসলামের পণ্ডিতবর্গ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা শুধুমাত্র সংরক্ষণ করেছিলেন তাই নয়, গবেষণা আর চর্চার মারফত আরও সূক্ষ্ম করে তুলেছিলেন (পৃ ১৭-১৯)। জ্ঞান আর সত্যের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের মূল সত্তা। মহানবী হযরত মোহাম্মদ ছিলেন আজীবন সত্যানুসন্ধানী। তিনি বলেছেন, 'জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।' 'জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীনদেশেও যাও' (পৃ ১৯-২১)। আচার্য রায় এইসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সৈয়দ আমির আলির বই থেকে।

বিশ্বসভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় ফাতেমীয় এবং উমাইয়াদের অতুলনীয় অবদানের প্রসঙ্গটি আচার্য রায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। গণিত, মহাকাশবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়নবিদ্যা, ঔষধবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রগুলো তাঁকে চমকিত করেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চার সুবাদেই বাগদাদ, কায়রো এবং স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অজস্র গ্রন্থাগার। বিস্মিত হতে হয় এটি জেনে যে, খলিফা আল-মামুন গ্রীক সম্রাট তৃতীয় মাইকেলের কাছ থেকে বিশেষ একটি সন্ধির শর্তে কনস্ট্যানটিনোপলের একটি গ্রন্থাগার দাবি করেছিলেন। পেয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডার। টলেমির আরবি অনুবাদ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে সেটি "আলমাগেস্ত" নামে পরিচিত। অগণন গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করেছিলেন ইসলামধর্মী শাসকরা। মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ রচনা করেছিলেন Encyclopaedic Dictionary of all the Sciences। বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে (পৃ ২২-২৬)।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান তাঁর আলোচনার মধ্যে পড়েছে। ইতালির সালেরনোতে আরবীয়রাই সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং রাসায়নিক আবুমুশা জাফরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সেভিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহাকাশবিদ্যার গবেষণাগার। ইউরোপ নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আবু মুশা জাফর সম্পর্কে আচার্য বলেছেন, was the true father of modern chemistry (পৃ ৩১)। বিজ্ঞানসাধক হিসেবে মোহাম্মদ বেন মুশা, ওমর বেন ইব্রাহিম, আলবাগদাদীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অসাধারণ চিকিৎসক ও দার্শনিক ইবনে সিনা, অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষক কর্ডোভার ইবনে রুশদ, প্রাণিতত্ত্ববিদ আবু ওসমান, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ আল রাজি, আল আব্বাস এবং আল বাইতুর, পণ্ডিতপ্রবর আল গজ্জালির জন্য মানবসভ্যতা গর্বানুভব করতে পারে। আল হাজেনকে তিনি 'ছ

নিউটন অব দ্য আরবস' হিসেবে অভিহিত করছেন (পৃ ২৮-৩২)।

অতঃপর আচার্য রায় তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়েছেন ভারতবর্ষের দিকে। ভারতবর্ষকে তিনি বহুজাতিসত্তার দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দু এবং মুসলমান এদেশের যমজ সন্তান। মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ভারতবর্ষের মুসলমান, অতীতকালে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আসুক না কেন; হিন্দুদের মতোই তারা এদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এদেশের হিন্দুরা আর্য পরিচয়ে শ্লাঘা বোধ করে থাকেন—সেই আর্যরাও বিদেশ থেকে এসেছিলেন। আর্যদের বংশধর হিসেবে হিন্দুরা কি মধ্য এশিয়ায় "হিজরত" (শব্দটি আচার্য রায় প্রয়োগ করেছেন) করবে? এসব আজ হাস্যকর বিষয় হয়ে উঠেছে। মুসলমানরা শুধু এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে তাই নয়, শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অশেষ অবদান রেখেছে। হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম সাধনার ফলেই ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু বিশাল পুরুষ ইসলামধর্মী শাসকের দরবারে মর্যাদার আসন পেয়েছেন। এতৎসত্ত্বেও ইউরোপীয়রা মুসলমান শাসকদের নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থা কী ছিল—সেটি খতিয়ে দেখতে পরামর্শ দিয়েছেন। বহুভাবে নিন্দিত এবং ঘৃণিত আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করার কারণও তিনি খুঁজে পেয়েছেন (পৃ ৩২-৩৭)।

সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলামের জন্ম। ইসলাম ভ্রাতৃত্ব আর সামাজিক সাম্যের নীতি প্রচার করে। এই আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই গুরু নানক, কবির এবং চৈতন্য ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন (পৃ ৩৮)।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এদেশের হিন্দু আর মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে—এ আশঙ্কা তিনি করেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটি সত্য হয়েউঠেছিল। 'বেদে ফিরে চলো' এবং 'আদি ইসলামে প্রত্যাবর্তন' -ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে তিনি সমর্থন করেন নি। (পৃ ৪৪)। স্মর্তব্য, হাল আমলে সনাতনবাদী ধ্যানধারণা পুনরায় প্রশ্রয় পেতে শুরু করেছে।

বক্তৃতাটির উপসংহারে ইসলামের গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের প্রসঙ্গটি তুলে বলেন, Islam knows no soul-killing distinctions between man and man (পৃ ৫২)। এই বোধের উজ্জীবন প্রত্যাশা করেছেন 'ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির নবীন মূর্তি'—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আলিগড় বক্তৃতাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটিতে (২৭ নভেমবর ১৯২৬) প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে আচার্যের শিক্ষাদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে তিনি কোনোদিনই ব্যাপক গুরুত্ব দেন নি। যে শিক্ষা রুজি রোজগারের পথ দেখাতে পারে না, সেটি তাঁর কাছে নিরর্থক। পরীক্ষার মারফত প্রকৃত মেধা বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, এতে প্রফুল্লচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি 'গোলামখানা' এবং গ্র্যাজুয়েটদের 'মার্কাধারী মূর্খ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। পরিষ্কার বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অজ্ঞতা ঢাকিবার ছদ্মবেশ মাত্র।' তিনি লিখেছেন, 'ডিগ্রিলাভের জন্যে এই অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘোর অনিষ্ট করিতেছে। বর্তমানে যেরূপ ভ্রান্ত প্রণালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের সৃষ্টি হইতেছে, 'যাহাদের কোনো কর্মপ্রেরণা, উৎসাহ ও শক্তি নাই এবং জীবনসংগ্রামে তাহারা নিজেদের অসহায় বলিয়াই বোধ করে' (পৃ ৭৭)। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি একজন সফল ব্যবসায়ী গড়ে তুলতে পারে না। নির্দিষ্ট মাইনের কেরানির চাকরি বাঙালি যুবককে শ্রমবিমুখ করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব তাঁকে ক্লিষ্ট করে তুলত। 'দিনযাপনের গ্লানি' বাঙালি সমাজকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে—সেটি ছিল তাঁর কাছে গভীর ভাবনার বিষয়। এই সমস্যাটিকে তিনি সাধারণভাবে 'অন্নসমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আক্ষেপভরে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমায় কেউ যদি একদিনের জন্যও কলকাতার সর্বময় কর্তা করে, তবে ল-কলেজটিকে আমি আগে ভূমিসাৎ করি; ...এদেশের ছাত্র বি-এল পাশ করে ভাবেন, এম-এল হবেন। যেন বিধাতা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে পরীক্ষা পাশ করতে এবং যমসদনে যেতে।' শিক্ষিত বাঙালি যুবকের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব এবং কায়িক শ্রমের প্রতি অশ্রদ্ধা আচার্য রায়কে বিচলিত করেছিল। 'বাঙালী কেরাণী পাঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল, আর কিসে চাকুরী বাগাইব, মস্তিষ্কের প্রখরতা উহাতেই ব্যয়িত করিতে লাগিল। বস্তুতঃই উদরের উৎকট চিন্তা বাঙালীর মনুষ্যত্ব পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে।' ("বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার")।

এই প্রেক্ষিতেই মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন আজও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। 'কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরুদ্ধেই প্রচার করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য মোটেই সেরূপ নয়। আমাদের যুবকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য যে অস্বাভাবিক উন্মত্ততা দেখা যাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ। আমি চাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য বাছাই করিয়া খুব অল্পসংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে। যাহার ভিতরে উচ্চশিক্ষালাভের প্রেরণা নাই, তাহার কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও উন্নতির সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ হইবে' (পৃ ৭৯)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জন না করেও স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠা যায়, তার উজ্জ্বলতম নজির হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন কয়েকজন অসাধারণ পুরুষের নাম। শেকসপীয়র গ্রীক অল্প জানতেন। লাটিন জানতেন আরো কম। কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন নি। বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস, নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী আইভান আলেক্স বুনিন, রামজে ম্যাকডোনাল্ড, মুসোলিনি, হিটলার এবং স্তালিন স্বোপার্জিত জ্ঞানেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। 'লগকেবিন' থেকে আব্রাহাম লিঙ্কন হোয়াইট হাউসে উঠেছিলেন। ইংল্যানডের দ্বিতীয় শ্রমিক মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই জীবন শুরু করেছিলেন দিনমজুর হিসেবে, (পৃ ৬৫, ১০২)। জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যে জরুরি নয়—সে কথাটিই এখানে অনুধাবনযোগ্য করে তুলেছেন।

মাতৃভাষার মারফত শিক্ষাদানের নীতির ওপর শিক্ষাবিদ রায় গভীর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ১৯২৬-এ, আলোচিত বক্তৃতাটিতে। তিনি বলেছেন, 'ভারতে যে শিক্ষাপ্রণালী বর্তমানে প্রচলিত, তাহা পরীক্ষা করিলে বলিতে হইবে, আমাদের সর্বপ্রথম অপরাধ বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষানীতির এই ভ্রম—যাহা আমাদের বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে—আমরা অতি অল্পদিন পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছি। ...ইংরেজি বা অপর কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতি আমি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি না; কেন না ঐসব ভাষা শিক্ষার ফলে জ্ঞানের নূতন দ্বার খুলিয়া যায়। আমার বলিবার কথা এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রথমত সব বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃভাষার সাহায্যেই উহা করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় মাতৃভাষা।' (পৃ ৫৯-৬০)।

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক স্থাপনের ওপর তিনি

জোর দিয়েছিলেন। মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটি জরুরি ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, চিন্তাচর্চা বিনিময়ের ফলে কে ব্রাহ্মণ, কে অ-ব্রাহ্মণ, কে মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান—এই খণ্ড, ক্ষুদ্রচিন্তার নিরসন হবে (পৃ ৭৫-৭৬)। আসল শিক্ষকেরও তিনি সন্ধান করেছেন (পৃ ৭৫)। ছাত্রের গৌরবে গুরুর গৌরব—এই আদর্শ তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি উদ্ধৃতিযোগ্য: 'উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে।' 'তিনি [প্রফুল্লচন্দ্র] তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করেছেন।' প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই বলতেন, 'সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আচার্য রায়ের ছাত্র এবং ভাবশিষ্য অধ্যাপক কুদরত-এ-খুদা প্রণীত "যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প" নামক পুস্তিকাটিতে মুহূর্তে-মুহূর্তে আচার্য রায়ের উপস্থিতি অনুভূত হয়।

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটিতে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমের উদ্‌গমন হতে পারে, এমন জাতীয় শিক্ষার প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। পুনশ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং মাতৃভাষার ওপর। বস্তুত এই ভাষণটি প্রায় মহীশূরের অনুরূপ। সংকলনটিতে বারাণসী বক্তৃতার তারিখ, সাল উল্লেখ করা হয়েছে ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩৩। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিকী সংকলনে উল্লেখ করা হয়েছে ১১ ডিসেম্বর ১৯৩০। ফলত, ধন্দে পড়তে হয়। এই সূত্রটিতেই লক্ষ করা গেল আলিগড় বক্তৃতাটির উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে—'Convocation Address at the Jamia Millia Islamia College, Aligarh, February 7, 1923.

আলিগড় বক্তৃতাটির ওপর বিশ্লেষণধর্মী একটি ভূমিকাও সংযোজিত হয়েছে এই পুস্তকটিতে। এটি লিখেছিলেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ইসলামবিদ এ. এম. খাজা ১৯২৩-এর সেপটেমবরে। কোরানের একটি বাণী—*Kanan Nasa Ummatan Wahidatan* (Humanity forms one nation)-র ওপর গভীর আস্থা রেখেই এই অসাধারণ মূল্যবান আলোচনাটি করেছিলেন এ. এম. খাজা। বেশ বোঝা যায়, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে—এই বক্তৃতা-সংকলনটি।

কবিতা যেন নির্বিশেষ রম্যতায় আচ্ছন্ন

সুজিৎ ঘোষ

কবিতার আলোচনায় দশক দিয়ে চিহ্নিত করার পদ্ধতিটি চালু থাকলেও, কবিতাকে বা কবিকে দশক-শতকের মাপে বাঁধা যায় না। তবু, সাহিত্যের আলোচনায় যুগ-বিভাগ মানতে হয়, এবং সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে দশক ধরে বিচারে ভ্রান্তি অনিবার্য হলেও, অন্য পন্থা থাকে না।

বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় কাব্য-নির্মিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষণীয়। আঙ্গিক এবং প্রকরণগত দিক থেকে এই কালের কবিরা বহু ভালো কবিতা লিখেছেন, লিখছেন। তিরিশের দশকে বাঙলায় আধুনিক কবিতা লেখা হয়েছে অনেক, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছেন মাত্র পাঁচ বা ছ জন কবি। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে এসে জ্যেষ্ঠ কবিদের পাশাপাশি নতুন কবিদের সংখ্যা অনেক বাড়ল এবং তারতম্য সত্ত্বেও অনেকেই কিছু উঁচু মানের কবিতা লিখলেন। নানা কবিতা-আন্দোলন পাঠকসংখ্যার সঙ্গে কবির সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে বলে অনুমান করা চলে। সকলেরই কবিতা যেন নির্বিশেষ রম্যতায় আচ্ছন্ন।

অলোকরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ যৌবন বউল-এর হার্দ নম্র উচ্চারণ সেই সময়ের পাঠকের কাছে তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছিল। সে কাব্যে কবিতার কারু-কর্ম ভাবের অঙ্গে ত্বকের মতোই অভিন্ন। সময়ের সঙ্গে নানা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়েছেন। "দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে" অলোকরঞ্জনের ১৯৮৩-তে প্রকাশিত গ্রন্থ, অর্থাৎ ইতিমধ্যে আরো অর্ধযুগ কবি নতুন কবিতায় এগিয়ে গেছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের উত্তেজক নামকরণ অবশ্য প্রকাশকের, গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তাইরেসিয়াস'-এর প্রথম পংক্তি। গ্রীক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ মিশে কবির জীবনের অর্থ-অন্বেষা এই কবিতায়—

বলেছি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অংশ তুলে :
তুমিই পুরুষ, তুমি নারী, তুমি যুবন এবং
সুকুমারী ; আচম্বিতে নড়বড়ে লাঠিতে ভার রেখে
জীর্ণ তুমি বৃদ্ধ তুমি ঝুঁকে পড়ো তারপরে সহসা
নীল পাখি, সবুজ হে লোহিতাক্ষ তা-ও তুমি'—
তবে কি তোমারও
পরিণামে স্পষ্ট কোনো মুক্তি নেই ?

অক্ষরবৃত্তের লয়ে রেখেও শব্দকে স্ব-ইচ্ছার অধীন চালাতে পারেন অলোকরঞ্জন এবং সেই ক্ষমতাতেই 'তুমি যুবন এবং' নির্দ্বিধায় ছ মাত্রায় পরিণত করতে পারেন, আবার 'সুকুমারী; আচম্বিতে নড়বড়ে লাঠিতে ভার রেখে'—আট-দশ-এর অক্ষরমাত্রিক রূপটি রেখেই 'নড়বড়ে' শব্দের আঘাতে ধ্বনির প্রবাহে ছেদ পড়তে-পড়তেও শুধু উৎরেই দেন না, লাঠির দৃঢ়তার অভাব, অবলম্বনটিতে ভরসাহীনতাও ধ্বনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এ-কাব্যের সর্বত্র প্রায় এ-রকম সূক্ষ্ম কাজ আমাদের চোখে পড়বে। ছন্দের কবিতায় অলোকরঞ্জনের দক্ষতা মুগ্ধ করে :

তোমাকে দিই
পদ্মবনের প্রথম মধু সাগর থেকে সংগৃহীত ক্ষীর
তোমাকে দিই
ভোরের আলোর চূর্ণ পরাগ যখন আমার চীবর
সন্ন্যাসীরও
ঈর্ষা জোগায়
কল্‌মিলতার শিল্পকলায় সপ্তডিঙা যখন থমকে যায়
জোয়ার-জেদী
নদীর জলে ঘৃতপ্রদীপ আগুন জেলে কুমিরকে
খেলায়

তোমাকে দিই
রুদ্রবেলার দুঃখদহন বিষামৃতে সিঞ্চিত রুধির
আজ যদিও
সঙ্গে আছি আমার পরে যে আসবে তার হাতেই
এসব দিয়ো। (ডুবুরি)

'ক্ষীর-রুধির' বা 'সন্ন্যাসীরও-দিয়ো'—অন্ত্যমিলের এই অপ্রকট খেলা বা 'সংগৃহীত'র মতো ভারি শব্দের প্রয়োগ কিংবা 'জোয়ার-জেদী' নদীর মতো শব্দবন্ধের সৃষ্টিতে কবি যে কতখানি তাঁর শিল্পের আধার-সচেতন, পরিশ্রমী তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এক-একটি অক্ষরে সাজিয়ে তোলেন ভাব, কবি বলতে পারেন, 'এক দৃষ্টিতে বিঁধেছো আমার মুগ্ধময়তা, / সত্য যেভাবে দর্শককেও পরখ করে।' / অথবা 'বেড়ার উপর অর্ধেক ভর করে / দাঁড়িয়ে তুমি তুমি নিরপেক্ষ, ব্রহ্ম যেমন একটি অক্ষরে— / আঁকতে গেলে জীবন যাবে, টান

দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। নাভানা, ১৯৮৩। দশ টাকা।

আগুনের ডালপালা—অমিতাভ দাশগুপ্ত। নাভানা, ১৯৮৩। দশ টাকা।

শ্রেষ্ঠ কবিতা—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৬। কুড়ি টাকা।

শ্রেষ্ঠ কবিতা—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। নাভানা, ১৯৮৭। পঁচিশ টাকা।

কায়া নৌকায়—তরুণ সান্যাল। অরণি প্রকাশন, ১৯৮৯। দশ টাকা।

ত্রেল অক্ষরের বই—রবীন সুর। অরণি প্রকাশন, ১৯৮৯। পনেরো টাকা।

পিছন দিকে ফিরে—রবীন সুর। অরণি প্রকাশন, ১৯৮৯। কুড়ি টাকা।

লেগেছে দেহের অঞ্জলিরে।'—তবু মনে হয়, কোথায় যেন 'মৃন্ময়তার'ই অভাব ঘটছে, সম্ভবত দুই মহাদেশের মধ্যে চলাচলে সতত উড্ডীন কবি কোথাও সম্পূর্ণ ভর দিতে পারছেন না, 'বেড়ার উপর অর্ধেক ভর করে' শব্দ-ব্রহ্মের আঁকার খেলায় নিমগ্ন। কোনো পাঠক বলতে পারেন, অলোকরঞ্জনে কেন সমকাল, সমাজ আরো তীব্রভাবে আসে না? অলোকরঞ্জন কেন শঙ্খ ঘোষের মতো লেখেন না—এ-প্রশ্ন যেমন বাতুলতা, তেমনই এই নিমগ্ন কবির কাছে তাঁর স্বীয় বৃত্তের বাইরে কী চাইব আমরা? তিনি তাঁর স্বভাবে যে কবিতা সৃষ্টি করেছেন, তার স্বাদে তুষ্ট থাকাই শ্রেয়।

"আগুনের ডালপালা" অমিতাভ দাশগুপ্তের ছত্রিশটি কবিতার সংকলন। এই কাব্যগ্রন্থের কোনো-কোনো কবিতায় সমর সেনের মতোই লুপ্ত রোমানটিকতার হাহাকার। যেমন:

'আমরা কেউ /ততখানি নিসর্গ-শিকারী নই,/নই পশু-পাখির প্রেমিক,/ অথচ সেদিন কেন/ গালুডির বসন্তবাগানে/ আমাদের ব্যক্তিগত কথার ফোকরে/ আচমকা ঢুকে গেল দু-তিনটি ময়ূর?' অবশ্য, সমর সেনের যুগে এ ধরনের কবিতার যে অতিরিক্ত চমক ছিল, তা এখন থাকে না। কবির সচেতন সামাজিক দায়বোধ কয়েকটি কবিতায় বোঝা যায়: 'হাভাতে-চোয়াড়ে মানুষেরা সম্বচ্ছর/ঘামে ধোয়া চাল/ দু-মুঠো পাবে কি পাবে না?' (চাল) অথবা, 'কাঁড়া না আকাঁড়া? এ-প্রশ্ন বিলাসিতা/ খরায় উপোসে ভিক্ষার চাল তুমি।' (আহা চাল)। কবি ভূমিকায় লিখেছেন, 'শুদ্ধ' কবিতা কী জিনিস, আমি জানি না। কবিতা লেখাকে আমি জীবনযাপনেরই অন্যতম শর্ত বলে মানি।'—তাঁর এ-বক্তব্যে যতখানি সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্যে পাঠক প্রস্তুত হন, ততখানি সমাজ প্রাধান্য এ কবিতায় পাঠক না-ও পেতে পারেন। কিন্তু, তাঁর কবিতায় নিসর্গ আসে নানা চিত্রকল্পে, স্বচ্ছন্দ পদপাতে—'সোনামুগ-রঙা মেঘ', 'বিষে নীল উন্মত্ত উত্তরীয়', মেঘে 'খড়গপ্রতিম গ্রীবা', সমস্ত গঙ্গা 'একটি আভূমিপ্রণণতা নারী' ইত্যাদি চিত্রকল্পে বা 'মেরুন রঙের একা', বসন্তবাগান, জল, ঠিকঠাক, রঙের পাগল বন্যায়, ঈশানী, হাওয়া, আলোকধেনু ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতি বরং এক নম্র শুদ্ধতায় কবির অচেতনেই প্রতিফলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে তিনটি শোককাবতা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে রচিত; কবিতাটি আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে—সখ্যের নিবিড়তা যেন বৈষ্ণবীয় দাস্যে উত্তীর্ণ হয়। পুরবী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে কাবতাটির শান্ত রূপ মনে ছাপ ফেলে। কিন্তু 'নিহত বান্ধবী শ্রীলেখাকে' কবিতাটিতে মনে হয় ভাবের সঙ্গে ছন্দের চলন মেলে নি এবং প্রথম ও পঞ্চম স্তবকের শেষ পংক্তিতে ধ্রুবপদের মতো 'সব-কিছুকে বেঁটিয়ে তোমার মুখশ্রী খুব মনে পড়ল।—'খুব' শব্দটির প্রয়োগে শোকার্ততার পরিবেশ ছিন্ন হয়ে যায়। ছন্দ ভাঙার যে নিপুণ খেলা অলোকরঞ্জন দেখান, অমিতাভ দাশগুপ্তে তা সর্বত্র সার্থক হয় না, যেমন 'শাদা মেয়ে 'চিকো কাফ্রি' কবিতায় 'বুক দেখে ভয়ে চোখ' নেমে যায় পায়ে,/ ও আপেল নয়—ওকে ছিঁড়ে খাবে কে?' 'ছিঁড়ে খাবে কে'তে ধ্বনি ছিন্ন হয়ে লয় কাটে, তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য 'শুদ্ধ' কবিতার অঙ্গীকার না থাকায়, কবির এ-ধরনের ছন্দপাত সচেতন হতে পারে। 'বাঘের মুখে' বা 'বাঘ' ও 'রাত্রি' কবিতার প্রতীকী ব্যঞ্জনা ভালো লাগে। আর 'এমন তরল অগ্নি'র মতো কবিতায় আমরা যাকে 'শুদ্ধ কবিতা' বলে বুঝি, কবি সেই শুদ্ধতার কাছাকাছি পৌঁছে যান, যেন নিজেরই বিরোধিতা করে—

গানের গহন থেকে উঠে আসে রমণীর মুখ।

এত ফর্সা গ্রীবা
স্বর আর রক্ত ওঠানামা করে দেখা যায়।
কোমল রেখাবে

অমন তরল অগ্নি
একদিন ছুঁয়েছিল হেমন্ত আমার—
জ্বলে উঠেছিল দশ দিক।

এখন শীতের শুরু
দু'একটা খড়কুটো, নরম পালক
উড়ে এসে বসেছে টেবিলে,
শরীরের খুব নিচু আঁচে
সে গানের কথা কোন অবেলায় মনে পড়ে, প্রিয়।
তখনই হঠাৎ
গানের গহন থেকে উঠে আসে রমণীর অগ্নিময় গ্রীবা
শমীর গহন হতে লাল।

—এই কবিতাকে দায়বদ্ধ কবিতার শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি? তা করার প্রয়োজনও নেই। নামে ও প্রচ্ছদে যে 'আগুনের ডালপালা' তা কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট দহন আর উত্তাপ ছড়ায় না, বরং স্নিগ্ধ কমনীয়তায় কবিতাগুলি নরম। নাভানার পক্ষে প্রচ্ছদও কিছুটা উগ্র, সোচ্চার।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতায় কবির আটাশ বছর ধরে প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতাগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা কবিতাগুলি ছাড়াও দুটি কাব্যনাটিকা এবং ছাব্বিশটি বিদেশী কবিতার অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'লেখকের কথায়' শরৎকুমার এ-সংকলনকে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা না বলে নির্বাচিত কবিতা বলাই বোধহয় সঙ্গত' বলেছেন। আবার, গত বারো বছরে লিখিত অগ্রন্থিত বহু কবিতাও বাদ পড়েছে বলে জানতে পারি। কিন্তু ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত কবির ক্রম-পরিণতির প্রবাহ এ-গ্রন্থে ধৃত। যে সময়ে কবিরা আর ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখতে চাইছিলেন না, সে সময় অন্য কয়েক জনের মতো শরৎকুমার ছন্দে কবিতা লিখেছেন এবং একই সঙ্গে কথ্যভঙ্গির মধ্যে উপলব্ধিকে ধরতে চেয়েছেন, যেমন প্রথম দিকের রচনা 'দ্বিতীয় চিন্তা' কবিতায়:

আহা রে, নটীর বেশে আমাদের দুঃখের সংসারে
কখন ভিক্ষুক আসে দেখি না চিনি না; পিপাসায়
অন্ধ দীন দরিদ্র বালক ঊর্ধ্বে চক্ষু মেলে বলে, অহঙ্কারে
কিঞ্চিৎ মমতা দাও; শুনে দম্ভ শূন্যতা নাচায়।

ছন্দ রেখেও কথ্য রীতির চালের মধ্যেও 'শুনে দম্ভ শূন্যতা নাচায়'-এ 'শুনে-শূন্যতার' উচ্চকিত অনুপ্রাসের উপস্থিতি ছাড়া পাঁচটি দন্ত্যধ্বনির সমাবেশে সংহতির মধ্যেও ভাবের দ্রুত চলন আসে। শব্দের ওজন বিষয়ে শরৎকুমারের সতর্কতাও পাঠকের চোখে পড়বে, উদ্ধৃত কবিতাংশে 'কিঞ্চিৎ' শব্দে যুক্তব্যঞ্জনের উপস্থিতিতে 'ৎ' (খণ্ড'ত')কে দু মাত্রা ধরার সুযোগ অনায়াসে গ্রহণ করে পরের কবিতাটিতে ('মত্ত অবস্থায় রচিত') —'অথচ জানবে না কেউ গোপন ঝিনুকে রাখা পোকাগুলি মুক্তা হয়ে গিয়েছে বিস্ময়ে'—এই অক্ষর-মাত্রিক ত্রিশ মাত্রার পংক্তিতে 'জানবে' তিনমাত্রা শব্দটিকে অন্তহলন্তের জোরে দু মাত্রা করে নেন। চিত্রকল্প নির্মাণেও শরৎকুমারের চমক লাগানোর ক্ষমতা আছে, 'শীতল হিংসার হাত' 'মুষ্টিমেয় কটি' 'এক মুঠো পুলিশের লাল মাথা' পিয়ানো রীডের মতো সাজানো' দাঁত, 'অহংকার থেকে ভাপ উঠছে' ইত্যাদি অসংখ্য চিত্রকল্প ইতস্তত ছড়ানো। আর ছন্দের এই পরিশ্রমের ওপর যে 'নিমতলা শ্মশানে নববর্ষ'র মতো টানা গদ্যকবিতার বা আরো পরে 'স্ট্রেস সিরিজে'র কবিতাগুলির ভিত তৈরি হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। গদ্যছন্দে রচিত কবিতাগুলিতেও কথনভঙ্গিকে নিয়ে আসার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যাবে। কিন্তু পরিণত পর্বেও ছন্দের কবিতাগুলির মাধুর্য মনে দাগ কাটে:

'উদ্ধার করো'—তোমাকে বলেছি কবে,
তুমি বলেছিলে, 'হবে একদিন হবে,
আপাতত নাও গোলাপের চারা দুটি,
ফুল হলে যদি অনুরূপা—নামে ফুটি।'
(তোমাকে, পৃ ৭৮)

বা,

বৃষ্টি থেমে গেছে তাই চাঁদ উঠে এলো

হারানো বাছুর যেন ফিরে এলো মাঠে…
ফ্রকপরা মেয়ে যেন ইশ্‌কুলে না গিয়ে
ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে যায় শেষ তারাগুলি।
(ছবিকে শব্দের কাছে, পৃ ১০৮)

বা,

ফুলদানিতে ফুল ছিল
চন্দ্রার রূপ খুলছিল
নীল আলো তার কামরাঙা বেডকভারে,
(চন্দ্রলোক, পৃ ২৩)

কিন্তু শব্দ নিয়ে পরীক্ষায় কবির উপলব্ধি 'এত ভঙ্গুর এই বাংলা ভাষা—কোন্ দুঃখী এই ভাষা তৈরী করেছিল, কে জানে! প্রত্যেকটি শব্দ কেমন অসুস্থ, রুগ্‌ণ-যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া চেহারা, কষ্টের প্রতীক প্রত্যেকটি তৃতীয় অক্ষর ক্ষরণহীন—ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চায়, রোদের তাপ সইতে পারে না।

যেমন মন্দির, অথবা ভালোবাসা, কিংবা রমণী। শব্দগুলির অবয়ব দেখলে কে বলবে, কী মধুর অণুষঙ্গ ওরা বহন করে।'…(অক্ষর প্রতীক পৃ ৩৭)—তবু কবি বাঙলা ভাষাতেই কবিতা লিখে চলেছেন, এবং বাঙলায় লেখা হলেও এখানের দেশকালের ছাপ তীব্রভাবে শরৎকুমারের কবিতায় পড়ে না। মনে হয় অন্য ভাষাতেও অনূদিত হলে সে-কবিতার পাঠক স্থানিকতার বাধা বোধ করবেন না।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনটিও ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছরে প্রকাশিত আটটি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, তা ছাড়া একটি কাব্যনাট্যও এ-গ্রন্থের অন্তরভুক্ত হয়েছে। প্রবীর সেনের সুন্দর প্রচ্ছদটির পরে ভূমিকায় প্রণবেন্দুও বলেছেন, সংকলনটিকে শ্রেষ্ঠ না বলে 'নির্বাচিত কবিতা' বলতে চান। এবং 'সমস্ত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যেও একটি অছিন্ন সত্তা হয়তো কোথাও থেকে যায়। যাকে আমি নাম দিয়েছি জীবনবোধ।'

নাভানার ছাপা গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম শব্দ দুটির বানানভুল, প্রথম পৃষ্ঠাতেই পাঁচটি বানান ভুল এবং অপ্রয়াসেই চোখে পড়বে—ব্যথা, বহুল, বাহু, মূর্তি, আকাঙ্ক্ষিত, দূর, বধূ ইত্যাদি বানানের ভুল পীড়া দেয়, ফলে পূরবী মুখোপাধ্যায়কে 'অজস্র ধন্যবাদ' দিতে হয়। এ-সবই ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপানো যায়, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চরণ ব্যবহারে 'একদা কী যেন কোন পুণ্যের বলে' (হবে : একদা কী জানি কোন্ পুণ্যের ফলে…) এবং দ্বিতীয় বার একই কবিতায় (পূরবী, পৃ ১১২) 'কোন পুণ্যের বলে' প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের ওপর রীতিমতো বলপ্রয়োগ বলে মনে হয় ; বা, ওই একই কবিতায় 'তোমারই ঝর্ণাতলার নির্জনে, মাটির / ঐ কলসখানি ছাপিয়ে গেলো' (হবে : তোমারি ঝরনা-তলার নির্জনে / মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল…)—গীতবিতান তো সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শিক্ষিত বাঙালির গার্হস্থ্য অবলম্বন, রবীন্দ্রনাথের চরণ ব্যবহারে বাধাও নেই, কিন্তু কবিতাপ্রকাশকালে চরণ-গুলি মিলিয়ে নেওয়া যায়। প্রথমবার না হলেও, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে তোলার আগে এর শুদ্ধি প্রয়োজন ছিল। কোনো একটি কবিতায় রবীন্দ্র-চরণের এ-রকম দৃঢ়প্রত্যয়ী দুটি ভুল প্রয়োগ আমার কখনও চোখে পড়ে নি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের প্রথমাবধি ছোট লিরিকে দক্ষতা। পরিণত কালের কবিতাগুলিতেও তাঁর প্রিয় পাঠকরা প্রকৃতি মানুষ নিয়ে কবির জীবনবোধের স্পর্শ পাবেন। প্রণবেন্দুর বড়ো গুণ, উচ্ছ্বাসের ওপর রাশ টেনে রেখে কবিতা সংহত রাখেন, আকারে বড়ো হতে দেন না এবং তাঁর জীবনবোধের জন্য প্রথম থেকে শেষ কবিতা পাঁচটি (ঋতু গুহ, সুপ্রীতি ঘোষ, পূরবী মুখোপাধ্যায়, মন্দাকিনী ত্রিবেদী ও যামিনী কৃষ্ণমূর্তি) পাঁচ শিল্পীকে নিয়ে রচনা, কবির ব্যক্তিগত আবেগ-তীব্রতা প্রথম তিনটি রচনায় কবিতায় উত্তীর্ণ হয় নি।

"কায়া নৌকায়" তরুণ সান্যালের শেষতম কাব্য-সংকলন। মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতা এই সংকলনের অন্তরভুক্ত হয়েছে। কবি প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাটির বেহালা'য় উচ্চারণ করেছিলেন ক্ষুদ্র ক্লিষ্ট প্রাত্যহিক ক্ষয়ে। এ জীবনে চাই মহামরণের মুগ্ধ ভালোবাসা'—এ-রকম গভীরপ্রত্যয়ী পংক্তি আমরা দীর্ঘদিন স্মরণে রেখেছি। কায়া নৌকায় যাত্রী হিসেবে কবি দেশ-কাল ও পরিবর্তনকে লক্ষ করেন, 'কায়া নৌকায় পার হয়ে যাই / বানভাসি দেশে আয়ুর নদী।' সূচনা থেকে দীর্ঘ তেত্রিশ বছরে তরুণ সান্যালের কবিতায় এসেছে নির্লিপ্তভাব, কিন্তু কায়া নৌকায় যাত্রী হিসেবে চোখ খোলা রেখেই তাঁর যাত্রা, যাত্রাপথের বহু দৃশ্য, অভিজ্ঞতা এ-গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। কবি উপলব্ধি করেন, 'দেবদৈত্যের মিশল ভারতবর্ষে / নদীর অঙ্গে রণরঙ্গিনী উল্কি।' একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধ এ-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, তাই 'বাতিল ঘোড়ার উপাখ্যান'-এ পরিণতির ভয়ঙ্করতাও চিত্রিত করেন হালকা চালে :

আপনার সাথে আপনি যুঝেছ
সমস্ত রাত ঘোড়া,
ওরা এলো ভোরে, জয়টীকা দিল
কপালে বুলেট পোড়া। (পৃ ১৪)

বা,

ঘুঁটেকুড়ুনির নাকেও চুনির
লাল ফাঁদি নথ নাড়া
… … …
ভারতবর্ষে দেদার হর্ষে
পানসি চালালো তারা। (পৃ ১৬-১৭)

বা,

ভারত বলতে মানুষ বলতে জাতই
ও-জাতি বাঁচা করলে কুচি কুচি
মানুষ বটে ধুলোয় হেঁটেছিল
পায়ের সে ছাপ গোবরজলে মুছি! (পৃ ১৪)

স্বদেশ, স্বকাল, সমাজ সম্পর্কিত কবির এ-ধরনের অজস্র ভাবনা সমগ্র গ্রন্থে ছড়ানো, কিন্তু এক নিরাসক্ততা তরুণ সান্যালকে এ-কাব্যে অধিকার করেছে, কিন্তু মনে হয় অঙ্গীকারবদ্ধতার তীব্রতা এখানে কম। অথচ কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭৭-৮৮র বিক্ষুব্ধ জটিল দশক। অবশ্য ভূমিকায় তরুণ সান্যাল বলেছেন, 'বাঙালি কবিরা সিরিয়াস কবিতা ছাড়া সম্প্রতি লিখছেনই না। বহু ক্ষেত্রে পদ্যছন্দও তাঁরা এড়িয়ে যাচ্ছেন। "কায়া নৌকায়"-এর বেশ কিছু কবিতাই কিন্তু হাল্কা চালের। এবং সবগুলিই পদ্যছন্দে, স্বরবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে লেখা।' কোন্-কোন্ ছন্দরীতিতে কবিতা লিখছেন, পাঠককে শুরুতে তা বলে দিয়ে বোধহয় ভালোই করেছেন। কিন্তু, সিরিয়াস বা হালকা লেখা তো কবির লেখার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না, দেখার ভঙ্গির ওপর তা নির্ভর-শীল। এবং এই কাব্যগ্রন্থে দেখার যে নির্লিপ্ততার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তার ফলেই চলন হালকা হয়েছে। কিন্তু তাতে কাব্যের ঐশ্বর্য কমে না। আর এই হালকা চালের সুযোগেই ব্যবহৃত হতে পেরেছে অসংখ্য অতৎসম শব্দ ও নানা লৌকিক প্রয়োগ। ভাবতে ভালো লাগে, কবি হিসেবে এত বছর কাটানোর পরেও তরুণ সান্যাল কবিতার শব্দ-ছন্দ-প্রকাশের নিরীক্ষায় ক্ষান্তিহীন, তরুণ।

গত বছরে কবি রবীন সুরের মৃত্যু কাব্যপ্রেমীদের কাছে শোকাবহ ঘটনা। এ বছরে তাঁর তিনটি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের দুটি "ব্রেল অক্ষরের বই" এবং "পিছন দিক ফিরে"। কবিতার দক্ষ ও একনিষ্ঠ কারু-শিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচয় এবং ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও তাঁর পরিচয় বিস্তৃত ছিল। তাঁর শেষতম গ্রন্থে প্রকাশকের দীর্ঘ ভূমিকার তাই প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া, 'রবীন সুর পাঁচটি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে সপ্তসর্গের অমরাবতীর সাতটি সুরের গান গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন', বা 'রবীন সুরের কাব্যগ্রন্থের বিস্তার রাদারফোর্ড এবং বোর-এর পারমাণবিক খোলক গঠনের সঙ্গেই তুলনীয়'—ইত্যাদি অভিধা যদি আমরা বোধ্য ধরেও নিই, কবি

বেঁচে থাকলে এ-ধরনের ব্যাখ্যান মেনে নিতেন না বলে সন্দেহ হয়। কেননা যে কবি লিখেছেন, 'এইসব লেখাগুলি জঞ্জালের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ায়' বা 'রক্ত ছেঁচে কবিতা ওঠে, জীবন খুব শক্ত' (ত্রেল···, পৃ ৪৬-৪৭), 'ভেসে যেতে সাধ হয় কবিতার অনামী বন্দরে' —যে কবি বুঝেছেন, 'বিলম্বিত যৌবনের গান / চতুর্দিকে রটাতে রটাতে আর উনিশ শ সাতাশি/ কেবল ধমক দিচ্ছে: তুমি যাও পরিব্রাজকের/ নিবিড় সংসার ত্যাগে পেনশনের সীমিত বেতনে' (ত্রেল···, পৃ ২২) বা 'ভাটপাড়ার ১৯৮৭-র মতো মর্তপ্রোথিত কবিতা—তাঁকে উদ্ধৃত বিমূর্ততায় নিয়ে যাবার কারণ নেই। বরং কবি যা বলেছেন, 'আমি তো ভৈরবচক্রে ধ্যানে আছি, শব্দের তান্ত্রিক, / যা কিছু সুবর্ণরেখা দেখতে পাই শরীর সৈকতে— / বলো!' (পৃ ২২) এবং তন্ময়তায় তাঁর মনে হয় 'এই অন্ধকার ভালো, সূর্য নেই তবু শত সূর্যের কিরণ / সমস্ত আকাশ নিঙড়ে আদিম আকাশগঙ্গা শোকের উদ্ধার' (পৃ ১২)। এই কবির দৃষ্টিহীনতা সফল হয়ে ওঠে। এবং তন্ত্রের প্রতি এই ভ্রমাত্মক আসক্তির ফলেই সম্ভবত 'সংকল্প'র (ত্রেল-৫৫—কনট্রাসেপটিভ ব্যতিরেকে দুর্দান্ত সঙ্গমে / নিজেকে ঝালিয়ে নেব উত্তর পঞ্চাশে'—ইত্যাদি) কবিতা উত্তর-পঞ্চাশে, লিখতে পেরেছিলেন। এ-ধরনের যৌনভাবনা দুটি গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র ছড়ানো। যে পাঠক এই ভাবনায় আহত হবেন না, তিনি রবীন সুরের কবিতাকে আপন করে নিতে পারবেন। কিন্তু প্রায় পঞ্চান্ন বছর আয়ুতে কাব্যচর্চায় কারুশিল্পীর দক্ষতায় ছোটো লিরিকে অন্য পাঠকেরাও আনন্দ পেতে পারবেন, যেমন 'ব্রত' কবিতায়:

ঘুমের দেশ যেখানে নেই কেবল অন্ধকার
যেখানে আর কেউ গাহে না দিনশেষের গান,
কেউ তো ঘর ঠিক পেল না, ভবনদীর পার
কোথায় আছে, এসব জেনে মেলে না সম্মান।

একা এসেছি, একাই যাবো। অনেক তিরস্কার
এপার নয় ওপার নয় মধ্যে খরস্রোতে
যেটুকু সুখ দুঃখ পাই সেটাই পুরস্কার
যন্ত্রে কোনো ভুল রাখি নি ভালোবাসার ব্রতে।
(ত্রেল, পৃ ৩৪)

এরকম কবিতা আরো আছে: কয়লাকুঠি, মুখের ছবি, ভাঙা মিনারের গল্প, জিজ্ঞাসা, অনামী বন্দর, উৎসব, শক্ত জীবনানন্দ, (ত্রেল···) সন্ধান, বারান্দাবিষয়ক, শিশুর নিশ্চিতি চাই, হারানো মানুষ, রোদ্দুরের পেখম, খেদ, জানাই কেমন করে, বিলটুর জিজ্ঞাসা (পিছন দিকে ফিরে) প্রভৃতি। জীবনানন্দের সম-আয়ুর এই কবির মোট পনেরোটি কাব্যগ্রন্থ এতাবৎ প্রকাশিত, (জীবনানন্দের সাতটি গ্রন্থ)। রবীন সুরের লিরিকগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশক প্রকাশ করতে পারেন বা ভিন্ন রুচির পাঠকের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন সংকলনও তো হতে পারে।

জানুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যা

"চতুরঙ্গ"-র জানুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য প্রথম প্রবন্ধ "গান্ধীজী, হিন্দুধর্ম এবং এর সাম্প্রতিক ব্যাখ্যাতারা"। বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ গবেষণাধর্মী এই প্রবন্ধটি লিখেছেন আনন্দ-পুরস্কার-খ্যাত গান্ধীবাদী লেখক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

প্রতিবেশ : প্রতিবেশী

মহাশ্বেতা চৌধুরী

সমসাময়িক চিন্তাভাবনায় প্রতিবেশসচেতনতা পাশ্চাত্ত্য জগতে অনেক দিনই গুরুত্ব পেয়েছে, তার ঢেউ আজ আমাদের অপেক্ষাকৃত কম সমাজসচেতন মানসিকতায়ও সাড়া জাগাচ্ছে। প্রতিবেশবিজ্ঞানের প্রধান বিচার্য বিষয় আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থাৎ গাছপালা, রাস্তাঘাট, পরিবেশদূষণ ইত্যাদি। মানুষের জীবনধারণের উপযোগী প্রতিবেশ গড়ে তোলা ও অন্তরায়গুলিকে দূর করা সম্বন্ধে আজকের বিজ্ঞানী আর সমাজবিদ্ তৎপর হয়েছেন। এই প্রবন্ধে আমি অন্য একটি প্রতিবেশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি যা প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমি পরিবেশ হিসেবে মানুষের (human element) কথা বলছি। মানুষকে সেই প্রাচীন যুগ থেকে দলচর জীব বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করতে ভালোবাসে। একথা সবার জানা যে, মানুষ জীবজগতের একাংশ হলেও সে তার বুদ্ধিবৃত্তির জন্য যেমন একদিকে অনেক জটিলতর (অন্যান্য জীবের তুলনায়) সমস্যার সম্মুখীন হয়, তেমনি অনেক গভীরতর আনন্দেরও অধিকারী হতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি প্রাত্যহিক জীবনকে অনেক সহজ আর আরামদায়ক করে তুলেছে ঠিকই, তবে তার জন্য দিতেও হয়েছে অনেক—পরিবেশদূষণ তার মধ্যে একটি অন্যতম উচ্চমূল্য। আমি পরিবেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা দূষণ দূর করার কার্যকর পন্থা সম্বন্ধে কিছু বলছি না। বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে নানা আলোচনা করেছেন এবং নতুন-নতুন পন্থাও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

আমার উদ্দেশ্য নিছক যুক্তিধর্মী—অর্থাৎ প্রতিবেশ সম্বন্ধে মানসিকতা পরিবর্তনের একটি নৈতিক-দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই বিশ্লেষণে দু-একটি মূল নৈতিক প্রশ্নের অবতারণা করা প্রয়োজন। অন্তত ভারতবর্ষে নাগরিক জীবনেই বিজ্ঞানের প্রভাব বেশি। সুখসুবিধার সঙ্গে যান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যান্য উপসর্গও নাগরিক জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকারখানার, গাড়িঘোড়ার নানাবিধ গ্লানি যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করেছে—যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুতগতি তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানারকম চাপের সৃষ্টি করেছে। বড়ো-বড়ো বাণিজ্য-কেন্দ্রিক শহরে, বিশেষ করে কলকাতায় (হায় জীবনানন্দ! তোমার কল্লোলিনী তিলোত্তমা!) জীবন তো ধোঁয়ায়, ভিড়ে, কাদায়, দারিদ্র্যে, রাজনীতি-অর্থনীতির, দেশভাগের হাজার বিষাক্ত যন্ত্রণায় মথিত মানুষকে সব রস নিংড়ে বোধহীন জড়পদার্থে পরিণত করছে। প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে তার যাত্রা একক, নিঃসঙ্গ। মার্কস অবশ্য আধুনিক নগরসভ্যতার দান এই বিচ্ছিন্নতাকে (অ্যালিয়েনেশন) মূলধন-শাসিত সমাজের অপরিহার্য ফল বলে মনে করেছেন। যে কারণেই হোক, এই নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা আজকের নাগরিক (আরবান) মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক, প্রায়-স্বার্থপর, পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলেছে। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলি মেটাতেই তার শক্তি,

উদ্যম, সহিষ্ণুতা নিঃশেষিত—প্রতিবেশ, প্রতিবেশী : সব-কিছুই তার কাছে অর্থহীন।

আমার এই বিশ্লেষণ সমাজতাত্ত্বিক। শুনতে প্রায় সাফাই গাওয়ার মতো লাগছে। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া এক, আর তার নৈতিক মূল্যায়ন আরেক ব্যাপার। কেউ যদি অফিসের তহবিল থেকে টাকা চুরি করে—মেয়ের বিয়ের পণ দেওয়ার ব্যাপারটিকে সে ঘটনার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় কাজটির ন্যায়-অন্যায়-বিচার সম্পূর্ণ হয় না। আজকের শহুরে মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার মানুষের পরিবেশ সম্বন্ধে নিস্পৃহতার আংশিক ব্যাখ্যা হয়তো তার দৈনন্দিন জীবনের চরম দুর্ভোগের উল্লেখ করে করা যায়—কিন্তু তবু এই উদাসীনতা বা কখনো পজিটিভ নিস্পৃহ মনোভাব কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়, অর্থাৎ নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বরং সমাজের দিক থেকে, (আশ্চর্য মনে হলেও) নিজের দিক থেকেও অন্যায়, অবিবেচক, সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক। এই নৈতিক মূল্যায়নে আমি কেসস্টাডি হিসেবে কলকাতা আর তার মানুষকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করব।

প্রতিবেশ সম্বন্ধে উদাসীনতার এই অভিযোগের দুটি পরিসর আছে। প্রথমত, মানুষ (কলকাতার সাধারণ মানুষ) তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন নয়, অন্যের স্বার্থ বা নিরাপত্তায় তার উৎসাহ নেই। বরং তার পরিপন্থী কাজেও সে সহায়ক হয় যদি নিজের কোনো কাজের তাতে সুবিধা হয়। এক বাড়ির উনুন এমনভাবে জ্বালানো হয় (অনেক সময় রাস্তায়) যাতে ধোঁয়াটা তার নিজের বাড়িতে না গিয়ে অন্যের বাড়ির দিকে যায়। রাত্রিবেলা সশব্দে মশলা পিষলে আমার সুবিধা হয়, সুতরাং তাতে যদি নীচের তলায় ছাত্রের পড়ার বা পাশের বাড়ির রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়, সে চিন্তা আমার নয়। কলকাতাবাসী যে-কোনো লোক এমন দৃষ্টান্ত ভূরি-ভূরি দিতে পারেন তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। দ্বিতীয়ত, শুধু যে অন্যের নিরাপত্তা বা সুবিধা সম্বন্ধেই আমরা (মানে কলকাতার বেশির ভাগ মানুষ) উদাসীন তা নয়, নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে, মঙ্গল সম্বন্ধেও আমাদের চেতনা সজাগ নয়। ঝুলন্ত অবস্থায় বাসে ভ্রমণ, বাস ছাড়লে তারপর চলন্ত অবস্থায় তাতে ওঠা বা নামার মতো বীরত্বে সাধারণ শহুরে মানুষের মজা। ট্র্যাফিক-সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা, গতিসীমা (আছে কিছু কলকাতায়?) লঙ্ঘন করা, ইলেকট্রিক ট্রেনের মাথায় ভ্রমণ—এসবই বহু সময় মৃত্যু বা অন্যান্য বিপদ ডেকে এনেছে—তবু তা বন্ধ হয় নি। আমার উদ্দেশ্য এই দুটি পরিসরেই একটি সাধারণ কারণের অনুসন্ধান করা।

সভ্যজগতের যে-কোনো সমাজব্যবস্থায়, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক আদর্শের (ভারত গণতান্ত্রিক না?) মূল কথা হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান প্রবর্তক জন স্টুয়ার্ট মিল এই ধারণাটিকে আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি মনে করেছেন। তাঁর মতে যে-কোনো ব্যক্তির আচরণ, বাক্য, ধর্ম : সবকিছুতে চরম স্বাধীনতা আছে—এ-বিষয়ে কোনো রকম সামাজিক আইন বা শাসন ব্যক্তির চরম অধিকারে হস্তক্ষেপ। তবে এই স্বাধীনতার একটি সীমারেখা আছে, তার নিয়ন্ত্রক হল 'harm principle', অর্থাৎ যে-কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারে ('private sphere') চরম স্বাধীনতা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কর্ম বা আচরণ অন্যের ক্ষতি না করছে। নীতিটি শূন্যগর্ভ নয়। অধিকার (রাইট) এবং দায় (ওবলিগেশন) একই ধারণার এপিঠ-ওপিঠ। আমার নিজস্ব ব্যাপারে যদি আমার চূড়ান্ত অধিকার থাকে, তবে একই সঙ্গে আমার সামাজিক দায় আর কর্তব্য হল অন্যের সেই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি আর সম্মান জানানো। অর্থাৎ যে কাজ আমার কাছে অস্বস্তিকর আর অবাঞ্ছনীয়, তেমন কাজ অন্যের কাছেও সমান অস্বস্তিকর হবে। এই চেতনা গণতান্ত্রিক

আদর্শের ক-খ। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি স্বাধীন, কিন্তু সেই অধিকার একই সঙ্গে অন্যের সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি দাবি করে—নইলে সমাজব্যবস্থা অচল হবে, দৈনন্দিন জীবন হয়ে উঠবে অবিচারের ক্ষেত্র।

প্রতিবেশ সম্বন্ধে নিন্দনীয় নিস্পৃহতার কারণ হিসেবে আমি শেষোক্ত উক্তিটি করেছি। যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এই উক্তির যাথার্থ্য বোঝা যাবে। প্রতিবেশী অর্থাৎ আমার চারিপাশে যাঁরা রয়েছেন—দোকানদার, ড্রাইভার, কনডাকটর, সহযাত্রী, সহকর্মী, পাশের বাড়ির লোক, ছোটো-শিশু—এরা সবাই আমার মতো সামাজিক ব্যক্তি। অন্য পরিবেশের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে এরাও জীবন্ত, সক্রিয়। মানসিকতায়, সাহচর্যে, ইচ্ছায়, স্বাধীনতায় সামাজিক জীব। তাদের সবার নিজস্ব কর্তব্য, উদ্দেশ্য, জীবনরীতি আছে, যেমন আছে আমার। নিজের সেই জগতে আমি যেমন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (অটোনোমাস)—তারাও সেই দাবি করতে পারে আমার কাছে। সুতরাং আমার কাজ, ভাষা, ধর্মীয় আচরণ যেন এমন না হয় যাতে অন্যের ক্ষতি বা কষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক জড়-পরিবেশের সঙ্গে মানবিক পরিবেশের বড়ো পার্থক্য হল এই যে, দ্বিতীয়টি আমাদের ধ্যানধারণার ক্রমোন্নতিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে। কলকাতার পরিবেশ-অবনতির ব্যাপারে অন্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসের অভাব একটি বড়ো কারণ বলে মনে হয়। যে-কোনো হিংসাত্মক কাজ অন্যায়, কারণ তা কোনো না কোনো ভাবে অন্যের (শরীর, সম্পত্তি বা অন্য যা-কিছুর ওপর) চরম অধিকারকে অস্বীকার করে। যে-কোনো দু-চারটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখুন—তাতে অন্যের কোনো-না-কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আমি যদি শান্তিতে থাকতে চাই (যেমন পাশের বাড়িতে জোরে টি. ভি. চালালে বিরক্ত হই) তাহলে অন্যেও একই দাবি করতে পারে। এই সহজ অধিকারটুকু সম্বন্ধে যদি আমরা সজাগ আর সযত্ন হই—বহু অশান্তি, অযথা মনোমালিন্য, সময় আর সম্পত্তির অপচয় বাঁচে। মানুষের চেয়ে বড়ো প্রতিবেশ—বিশেষ করে (কলকাতার মতো) ঘন-বসতি শহরে আর কি আছে? সেই সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আজ শুধু কাম্য নয়, অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এ শুধু নীতির প্রশ্ন নয়, বাঁচার প্রশ্ন।

যুদ্ধপূর্ব কালে বা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে (অবশ্য তার আরও অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণ আছে) বরং মানুষের অন্যের প্রতি এই অনাসক্তি বা অন্যকে অস্বীকার করার এত রেওয়াজ ছিল না, গ্রামীণ সংস্কৃতির অবশিষ্ট প্রভাবেই বোধহয়। পরবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির আদর্শ সম্বন্ধে বহুল প্রচার নির্বোধ বা অপরিণত মস্তিষ্কে অধিকারবোধ সম্বন্ধে এক বিকৃত মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। সামাজিক স্বাধীনতা আর অন্যায় করার স্বাধীনতা যে এক নয়, একথা সবার কাছে স্পষ্ট হয় নি। ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় রাস্তায় আবর্জনা ফেলার অধিকার কারো নেই। একটি চকোলেটের কাগজ ফেললেও দশ ডলার জরিমানা হতে পারে। গতিসীমা লঙ্ঘন শাস্তির যোগ্য, মাথায় হেলমেট না পরে কেউ স্কুটারে ভ্রমণ করতে পারে না। গাড়ি যেখানে খুশি পার্ক করা যাবে না। অল্প সময়ের জন্য হলেও 'নো পার্কিং' এলাকা থেকে পুলিশ গাড়ি পেছনে বেঁধে গ্যারাজ বা পার্কিং এলাকায় (যেটা অনেক সময় বহুদূরে) রেখে আসবে। আমার এক বন্ধু একবার দশ মিনিটের জন্য লাইব্রেরিতে বই ফেরত দিয়ে এসে দেখে গাড়ি নেই। হাঁটতে-হাঁটতে দেড় মাইল দূরে থানায় গিয়ে খোঁজ করতে সন্ধান মিলল। চুরি হয় নি, পুলিশই ধরে এনে আরো দু মাইল দূরে রেখে এসেছে। জরিমানা তো লাগলই, তারও পর অতদূর যেয়ে তবে নিয়মভাঙার খেসারত পূর্ণ হল। আর অন্যকে বিরক্ত করা? সে তো আরও গুরুতর অন্যায়। প্রতিবেশী যদি অভিযোগ করে, পুলিস এসে তৎক্ষণাৎ

জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে, ধরে নিয়ে যাবে নয়তো তদন্ত করে শাসিয়ে যাবে। এমনকী টেলিফোনে যদি অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (যেটা পরিচিত ব্যক্তিও হতে পারে) জ্বালাতন করে, অভিযোগ করলে তাকেও খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমার প্রতিবেশী মাইক রজার্স ছিল সঙ্গীতের স্নাতক। স্ত্রী বিকেলবেলা বেসবল খেলতে যেত, তখন তিন বাচ্চার দেখাশোনা করত মাইক। ফাঁকে-ফাঁকে পিয়ানো সহযোগে তার সুন্দর গলার গান ভেসে আসত কখনো-কখনো। একদিন রাস্তায় তার গলার প্রশংসা করায় যে সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে আমি খুব বিরক্ত করেছি কি? ছি, ছি, নিশ্চয়ই বাচ্চারা দরজা খুলে রেখেছিল। আর কখনো হবে না।' যতই বলি, বিরক্ত তো হই নি, বরং আমার খুব ভালো লেগেছে, সে ততই লজ্জা প্রকাশ করতে লাগল। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এরা খুব সজাগ যাতে অন্যের অধিকার লঙ্ঘিত বা শান্তি বিঘ্নিত না হয়। অধিকার আর দায়িত্ব দুটি একইভাবে অনুসৃত হলে দৈনন্দিন জীবন সবার পক্ষেই সহজ হয়। সমাজসচেতন মানুষ যদি তার সহধর্মী পরিবেশকে অর্থাৎ মানুষকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে পরিবেশ-সমস্যার অনেকাংশই মেটানো যায়। কলকাতার দুটি ভয়াবহ যন্ত্রণা হল ভিড় আর আওয়াজ। যে-কোনো বহিরাগতর কাছে এ দুটি বিভীষিকার মতো মনে হয়, কলকাতাবাসী অবশ্য সে বিষয়ে নির্বিকার। এই দুই বিভীষিকায় কলকাতার স্থান খুব সম্ভবত পৃথিবীর অন্যান্য শহরের চেয়ে ওপরে। আক্ষরিকভাবে একথা সত্য যে, ধাক্কাধাক্কি না করে কলকাতায় হাঁটা যায় না, বাসে ট্রামে চড়া যায় না, দোকানে জিনিস কেনা যায় না। বিপুল সংখ্যাধিক্য তো প্রধান কারণ, ছাড়াও যেটা বহিরাগত বা বিদেশী-দের চোখে পড়ে তা হল অন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীনতা, ক্যালাসনেস। পাশ কাটিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে মেয়েদের কাছাকাছি এলে নিজেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা এখন বিগত যুগের স্মৃতি। ভিড় সব বড়ো শহরেই অফিস-সময়ে হয়, লনডনের টাউবস্টেশন বা নিউইয়র্কের 'পাথ' এবং পাতালরেলেও অমানুষিক ভিড় হয় সেই সময়ে। কলকাতার ভিড় তার চেয়ে বেশি নয়, শুধু বিশৃঙ্খল। বাসে ট্রামে বসার বা যাওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই সমান, কিন্তু সে অধিকারও অন্যের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে জারি করা যায়। কিছু পুরাতনপন্থী বা মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ ব্যক্তিই হয় অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়, যথা মহিলাদের পর্যন্ত প্রায় জড়পদার্থের মতো মনে করা অথবা অতিরিক্ত সচেতন হয়ে অন্যকে তার নিজের ব্যাপারে চালিত করা, যেমন 'আপনি একটু এগিয়ে যান না', কিংবা 'বাঁদিকের রডটা ধরুন' ইত্যাদি। একজন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পশ্চিমে নাকি গায়ে হাত লাগলে তার বিরুদ্ধে মামলা করে?' কথাটা মিথ্যে নয়। ইঙ্গ-অ্যামেরিকান 'প্রাইভেসি ল' আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যের খুব কাছাকাছি আসা বা গায়ে স্পর্শ লাগাকে তারা অপছন্দ করে এবং আইনত অন্যায়ও হতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে। এর ভিত্তি আমার পূর্ববর্ণিত মূল কারণে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ।

কলকাতার অন্য একটি বিভীষিকা হল আওয়াজ। ট্রাম, বাস, গাড়ি, রিকশা, মিনিবাস ইত্যাদির অব্যাহত হর্ন বাজানো, সংস্কার-না-করা ইনজিনের ঘড়ঘড়, লক্ষ-লক্ষ লোকের চিৎকার, কুকুর, গোরু, মোষ, কাকের পরিত্রাহি 'কা' 'কা' রবও আছে তার মধ্যে। তার সঙ্গে নতুন উপসর্গ জুটেছে ঘরে-ঘরে প্রচণ্ড জোরে টি. ভির অত্যাচার। এমনকী এ-সমস্ত আওয়াজ সঙ্গী বলে মানুষ কথাও বলে জোরে। ট্রামে বাসে পর্যন্ত উচ্চস্বরে আলাপ চলে—অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে শোনানোর জন্য। কারো মনে হয় না অন্যের ভালো নাও লাগতে পারে। কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপার থাকলে নিম্নস্বরে তা সারা যেতে পারে, অন্য কথা বলার জায়গা যে পাবলিক ট্র্যান্সপোর্ট নয়, এ বোধ আমাদের বেশির ভাগ মানুষের নেই। কাগজে যখন দেখি শব্দদূষণের বিভীষিকায় কলকাতার স্থান সর্বোচ্চে, লজ্জার সঙ্গে একথা কি আমাদের মনে হয় আমরাও কিছুটা দায়ী এর জন্যে? এটা কমানোও যায় আমাদের চেষ্টায়? বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাসের অসহিষ্ণু ঘনঘন হর্ন, আগে যাবার, নিয়মভাঙার মনোবৃত্তি (যা বহু সময়ে নিজের এবং অন্যের বিপদ ডেকে এনেছে) তিল-তিল করে এ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। আমার রুচি আর আনন্দের ভাগ জোর করে মাইক্রোফোনের সাহায্যে সারা পাড়ায় চাপিয়ে দেব—এ মানসিকতা মানুষের নিজস্ব এলাকায়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারে হস্তক্ষেপ। একটি বাড়ির আটটি ফ্ল্যাটে যদি রেডিও বা টি. ভি. পূর্ণশক্তিতে চলে—কী পরিমাণ আওয়াজ হয়, কেউ কি সচেতন আমরা সে বিষয়ে? সামাজিক অধিকার এক, আর তা প্রয়োগের স্বেচ্ছাচার অন্য ব্যাপার। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের লোকপ্রিয়তার একটি কারণ হল ব্যক্তিগত প্রয়াসের প্রাধান্যলোপ। যে-কোনো কাজে সরকারকে, পৌরসভাকে, উচ্চতর সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা এর অঙ্গ। সামাজিক সুখসুবিধার ব্যাপারে যেমন, পরিবেশের উন্নতির ব্যাপারেও তেমনি কলকাতার মানুষ কর্তৃপক্ষকে দোষ দেয় সর্বদা। হয়তো এ অভিযোগ অনেকাংশে সত্য, তবু প্রতিটি মানুষ কি এতটুকু চেষ্টাও করতে পারে না স্তরে-স্তরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে? এ কথা আক্ষরিকভাবে সত্য যে সারা কলকাতা একটা আবর্জনাস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোনো রাস্তায় ঢাকা ডাস্টবিন নেই—বস্তুত কোনো-রকম ডাস্টবিনই নেই বেশির ভাগ জায়গায়। পাহাড়ের মতো আবর্জনার স্তূপ, মানুষ, কুকুর, বেড়ালের নোংরা স্বাস্থ্যের অন্তরায় তো বটেই, কুশ্রীতার চরম দৃষ্টান্ত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে পৌরসভার প্রধান জানিয়েছেন পুজো উপলক্ষে কলকাতার আবর্জনা পরিষ্কার করা হবে। এর চেয়ে অ্যাবসার্ড কিছু আছে? শহর পরিষ্কার করার সিদ্ধান্তটা (তাও আবার বিশেষ উপলক্ষে) যেখানে 'সংবাদ' হতে পারে, সেখানে রাস্তায় আবর্জনা ফেলাকে কী করে মানুষ অন্যায় বলে মনে করবে? অন্যের প্রতি সমাজের প্রতি নিস্পৃহতা আজ এত গভীরে পৌঁছেছে যে বাইরের দিক থেকে অসহনীয়, কদর্য, অন্যায় বলে মনে হয়, তা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। নাইপলের মতো দু-চারজন যদি চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখায়, সে কটু সত্যভাষণ অপ্রিয় মনে হয়। কলকাতার মানুষ কি নিজেরা দলবদ্ধভাবে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়ে অরাজনৈতিক স্তরে বিভিন্ন সমস্যার—যথা রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা (না হয় অকর্মণ্য পৌরসভাকে দেখাবার জন্যই), কিংবা যানবাহনের জট ছাড়াবার জন্য কোনরকম চেষ্টা করতে পারে না? অনেক কিছুই তো দলবদ্ধভাবে হয়। পুজো, ফুটবল, জলসা···কিন্তু জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে উদাসীনতা, সমাজের এবং নিজেরও নিরাপত্তা সম্বন্ধে অন্যায় নিস্পৃহতার চূড়ান্ত নিদর্শন। নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করলে এই নির্লিপ্ততা থাকতে পারে না, অন্যের ওপর নির্ভরতা বেশি হলেই নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে নির্বিকারতা জন্মায়। প্রকৃত স্বাধীনতাবোধ কারো সাহায্যের প্রত্যাশী নয়—সে তার নিজের ক্ষমতায় কাজ করতে চায়। সমাজের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে একাত্মবোধের অভাব এই পরনির্ভরশীল মনোভাবের পরিচায়ক যা দায় সম্বন্ধে কোনো বোধ সৃষ্টি করে না অথচ অধিকার সম্বন্ধে জন্মায় বিকৃত অতি-সচেতনতা।

বহু আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ আর দার্শনিক নাগর জীবনের নিঃসঙ্গতা লক্ষ করে নগরপরিকল্পনার কাজে মানুষকেও প্রতিবেশ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন, অর্থাৎ রাস্তা, বাজার, দোকান বা পেট্রোলস্টেশন তৈরি করার কাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিক্রিয়ার অনুকূল অবস্থার কথা মনে রাখছেন। উচ্চতল বাড়ির বাসিন্দা-দের সঙ্গে ছোটো-ছোটো স্বতন্ত্র, আধা-স্বতন্ত্র বাড়ির অধিবাসীদের মানসিকতার, অন্যের প্রতি তাদের

মনোভাবের, তাদের শিশুদের পার্থক্য ইত্যাদি নানা-রকম সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চলছে ফেনোমেনোলজিকাল রিসার্চ এবং আরবান প্ল্যানিং-এর যৌথ চেষ্টায়। ডেভিড স্নীম্যান নামে এক মার্কিন অধ্যাপক এই নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করছেন। পেশাগত ভাবে আরবান জিয়োগ্রাফি পড়ান তিনি, শহর-পরিকল্পনায় মানুষের চিন্তার দার্শনিক দিকটি নিয়ে তাঁর বইও আছে। অনেক মধ্যাহ্নভোজের আলোচনায় তিনি ভারতের (যদিও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল মনে হল) যৌথপরিবার, ছোটোপরিবার, বাসস্থানের পরিকল্পনা, যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করছিলেন। উচ্চতল বাড়ির অধিবাসীদের নিঃসঙ্গতার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে, এবং তা দূর করার ব্যবস্থাও নগর-পরিকল্পনার অঙ্গ হেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিকল্পনায়, এমনকী বিস্তীর্ণ সবুজের মধ্যে জিগজ্যাগ বাঁধানো রাস্তার বিশেষ নকশা ছাত্রছাত্রীদের পরস্পরকে জানাশোনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে বা প্রতিকূল হতে পারে বলে মনে করেন ডেভিড। 'শপিংম্যলের' মাঝে-মাঝে বসার বেঞ্চ, গাছপালাকেও তিনি নাগরিকদের মানসিকতা গঠনে প্রাসঙ্গিক বলে চিন্তা করেন। বর্তমান আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত যুক্তির অবতারণা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নেই। আমার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, পরিবেশসচেতনতায় মানুষকে তার সহধর্মী অন্য মানুষকেও ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। সেই স্বীকৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ আমাদের নাগরিক জীবনের অজস্র সমস্যার কিছু অংশের সমাধান করতে পারবে। সমাধানও যদি না হয়, অন্যের সঙ্গে সে বোঝার চেষ্টায় নগরসভ্যতার অজস্র নাগপাশে পিষ্ট মানুষের অসহনীয় জীবন অন্তত নিঃসঙ্গ মনে হবে না।

সাক্ষাৎকার

"কবিকণ্ঠ"

আলপনা সেনগুপ্ত

সম্প্রতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের যুগন্ধর শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে রবিবাসরের সম্পাদক সন্তোষকুমার দে যে স্মৃতিচারণ করেন তা শুনে এবং 'অকৃব'-সম্পাদিত "শুভায় ভবতু" নামক পুস্তিকায় সন্তোষবাবুর 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থখানি সম্পর্কে আলোচনা পড়ে তাঁর কাছে আমি কিছু জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হই। উত্তরে তিনি যা বলেন এবং যেসব পুরাতন চিঠি ও নানা-তথ্য-সংবলিত প্রকাশিত আলোচনা দেখালেন তা আজ পর্যন্ত কোথাও একত্রে গ্রথিত হয় নি, অথচ রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনায় এই তথ্যগুলি মূল্যবান। সন্তোষবাবুর এখন বয়স ৭৪ বছর, তাঁর জীবৎকালে এই তথ্যাদি প্রকাশিত হলে তা প্রামাণিক বিবেচিত হবে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের গবেষকদের অনেক অনুসন্ধিৎসা মেটাবে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কবিকণ্ঠ" রচনার প্রেরণা কার কাছে পেলেন? গ্রন্থের ওই চমৎকার নামটিই বা কার দেওয়া?

উত্তরে সন্তোষবাবু বললেন—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার মূল দলিলসহ প্রাসঙ্গিক ফাইলটি কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মি. জর্জ তাঁকে দেখিয়ে তার প্রয়োজনীয় অংশ প্রকাশের অনুমতি দেন। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদিম রেকর্ডি এর তথ্য দিয়ে একখানি প্রামাণিক গবেষণা-গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান এবং তাঁর শিক্ষাগুরু আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনকে বলেন। প্রবোধচন্দ্র তাঁকে এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-সদনে' গবেষণার ব্যবস্থা করে দেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থের সন্তোষবাবুর দেওয়া নাম "কবিকণ্ঠ" তিনি অনুমোদন করেন এবং নামটির সার্থকতা ও শ্রুতি-মাধুর্যেরও প্রশংসা করেন।

"কবিকণ্ঠ" বেরোয় ফাল্গুন ১৩৬৯ (মার্চ ১৯৬৩)। তখন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আর বড়ো-বড়ো পত্রিকা গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা করেন, "কবিকণ্ঠ" শব্দটি নানা প্রবন্ধে ব্যবহৃত হতে থাকে, এমনকী 'কবিকণ্ঠ' নামে একটি কবিতার পত্রিকা পর্যন্ত প্রকাশিত হতে শুরু হয়।

প্রশ্ন করি—গ্রন্থের যুগ্ম রচয়িতা হিসাবে আর-একটি নাম শুধু প্রচ্ছদপত্রে এবং আপনার নিবেদনে উল্লিখিত আছে, কিন্তু আচার্য প্রবোধচন্দ্র-লিখিত ভূমিকায় বা আর কোথাও তাঁর উল্লেখ নেই কেন?

তিনি উত্তরে বলেন—'মূল গ্রন্থখানির তথ্যসংগ্রহে বারো-তেরো বছর একক চেষ্টায় আমিই কাজ করেছিলাম। প্রবোধচন্দ্র প্রথমাবধি সব জানতেন। তা ছাড়া রোজ অফিস ছুটির পর রেকর্ডিং ডিপার্টমেনটের মি. এ. সি. সেন আমাকে পুরাতন নথিপত্র, রেকর্ডিং-খাতা ব্যবহার করতে দিতেন। তিনি তাঁর বিভাগীয় কাজ করতেন, আমি আমার তথ্য সংগ্রহ করতাম, কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তাঁকেই প্রশ্ন করে জেনে নিতাম। সেখানে বাইরের লোক নিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না। কল্যাণবন্ধু শেষের দিকে এসে প্রেস-কাপি তৈরিতে কিছু সহায়তা করেছিলেন এবং আমার পত্র নিয়ে হিন্দুস্থান, মেগাফোন, পাইওনীয়ার প্রভৃতি অন্য রেকর্ড কোম্পানি হতে কিছু কাগজপত্র এনে দিয়ে

সহায়তা করতেন। তিনি একটি গ্রন্থাগারে কাজ করতেন। তাঁর চাকুরিতে সহায়তা হওয়ার আশায় তাঁর বিশেষ অনুরোধে আমি সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁকে যুগ্ম গ্রন্থকারের সম্মান দিয়েছিলাম, তা দেখে আমার শিক্ষাগুরু আচার্য প্রবোধচন্দ্র বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর লেখা ভূমিকাটি যখন ছাপা হয় তখনও পর্যন্ত কল্যাণবন্ধুর নাম দেওয়া সম্পর্কে কোনো কথাই ওঠে নি, এটা তাঁর অনুরোধে পরে আমি করেছিলাম।

বললাম—প্রবোধচন্দ্রের ভূমিকায় জানা যায়, এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে সুদীর্ঘ কাল ধরে একক চেষ্টায় দেশে-বিদেশে আপনি অনুসন্ধান করেছিলেন। আপনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে সারা জীবন কাজ করেছিলেন বলেই এ বিষয়ে গবেষণা করা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, যা আপনার আগে আর কেউ করেন নি। আর প্রবোধচন্দ্র আপনাকে ছাত্রাবস্থা থেকে চিনতেন বলেই তাঁর ভূমিকাটিও একটি নির্ভর-যোগ্য মূল্যবান দলিল হয়ে উঠেছে।

সন্তোষবাবু বললেন—কিন্তু ভূমিকাটি প্রবোধচন্দ্র লিখেছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ভারতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অনুরোধে, কারণ সন্তোষবাবু তাঁকেই ভূমিকাটি লিখবার জন্য আবেদন জানান। জবাবে সন্তোষবাবুকে উপাচার্য যে পত্রটি লেখেন সেটি এই—

VISVA-BHARATI
Founded By
Rabindranath Tagore

Sri S. R. DAS — SANTINIKETAN
Vice-Chancellor — West Bengal

ক্যাম্প : স্বপনপুরী, কালিম্পং
৩০. ৫. ১৯৬১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২৭ মে তারিখের চিঠিখানি পেলুম। 'রবীন্দ্র-সদনে' আপনি কাজ করবার সুযোগ পেয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন জেনে সুখী হলুম। রবীন্দ্র-সদনের রেকর্ড-তালিকা যে সম্পূর্ণ নয় সে কথা লিখে আপনি ভালোই করেছেন। আমাদের তালিকাটিকে সংশোধিত করে নেওয়া প্রয়োজন। আশা করি রবীন্দ্র-সদনের কার্যভার যাঁদের উপরে রয়েছে তাঁরা এবিষয়ে অবহিত হবেন। আপনার প্রস্তাবিত পুস্তকের একটি ভূমিকা লেখবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে খুবই সম্মানিত করেছেন। তবে এসব কাজে আমার অপটুতা জানি বলেই এই দায়িত্বভার নিতে সাহস করি না। সাহিত্যজগতে এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি ভূমিকাটি লিখে দিলে আরও সুন্দর ও শোভন হবে।

গ্রামোফোন কোম্পানি হতে আপনাদের যে শতবার্ষিকী সংখ্যা বের করেছেন তা এখনও পাই নাই। পেলে পরে নিশ্চয়ই পড়ে নেব। নমস্কারান্তে ইতি

ভবদীয়
শ্রীসুধীররঞ্জন দাস

শ্রীসন্তোকুমার দে
৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

গ্রামোফোন কোম্পানি-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী' গ্রন্থখানির সম্পাদক ছিলেন সন্তোষবাবু—যার বিষয়ে উপরোক্ত পত্রে উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থখানি বহুচিত্রশোভিত ছিল, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোম্পানির রেকর্ডিং বিষয়ে এগ্রিমেনটের দলিলটিও ছিল। এই দলিল এর আগে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—এইচ. বোসের রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া 'বন্দেমাতরম' গানের সন্ধান কী করে পেলেন? উত্তরে বললেন—লোকমুখে শুনে সত্য যাচাই করতে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার ১৯০৪-০৫ সালের ফাইল কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে

অনুসন্ধান করেন। তাতে এইচ. বোসের প্রসাধন-সামগ্রী, সাইকেল, এমনকী এডিসনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ যন্ত্র ও সিলিনডার রেকর্ডের বিজ্ঞাপন দেখেন, কিন্তু বন্দেমাতরম গানের রেকর্ডের হদিস পান নি। পুলিনবিহারী সেন তাঁকে পত্র দিয়ে পাঠালেন 'প্রবাসী' অফিসে। সেখানেও সে বিজ্ঞাপন খুঁজে পেলেন না। তখন পুলিনবাবুই সন্তোষবাবুকে নিচের চিঠিখানি দিয়ে পাঠালেন ড. সুকুমার সেনের কাছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, পুলিনবাবুর এই চিঠিখানি 'বিশ্বভারতী'-র উপাচার্যের চিঠিখানি লেখার সাত বছর আগে লেখা। চিঠিটি এই—

5. 6. 54

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৌলতপুরের ছাত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে আপনার কাছে যাচ্ছেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানের তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে 'গল্পলহরী'তে (হবে 'গল্প-ভারতী' পত্রিকায়) প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। H. Bose-এর রেকর্ড তালিকা দেখিতে যাইতেছেন। আপনার নিকট যে ছাপা তালিকাটি আছে তাহা দেখিবেন। আপনার ওখানে বসিয়া দেখিতেও প্রস্তুত। ইনি এখন HMV-র Publicity Officer.

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

ড. সুকুমার সেন সমীপেষু।

পুলিনবাবুর পত্রখানি পড়ে ড. সেন জানালেন, এইচ. বোসের রেকর্ড তালিকা তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে আছে। পরের সপ্তাহে গেলে দেখা যাবে।

কিন্তু পর পর কয়েক সপ্তাহ গিয়েও নিরাশ হতে হল। ড. সেন প্রতি সপ্তাহে বর্ধমান যেতেন বটে, কিন্তু ক্যাটালগ আনতে ভুলে যান। শেষে একদিন ড. সেনের গোয়াবাগানের বাড়িতে শনিবারে গিয়ে তিনি বর্ধমানে গিয়েছেন শুনে বেরিয়ে এসেই সন্তোষবাবু একটি এক্স্‌প্রেস্ টেলিগ্রাম করলেন ড. সেনের বর্ধমানের বাড়িতে। পরের সপ্তাহে গোয়াবাগানে গিয়ে সেই ক্যাটালগ পেলেন এবং সেখানে বসেই ক্যাটালগের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলির ফটো তুলে নিলেন। এটা ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের ঘটনা।

ওই ফটোগুলি নিয়ে স্বর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসুর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হিতেন্দ্রমোহন বসুকে দেখিয়ে তিনি অনুরোধ করেন, যদি কবিকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গানের রেকর্ডখানি ও-বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় তা একটু দেখতে।

বৈশাখ ১৩৬১ সংখ্যায় "গল্পভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত সন্তোষবাবুর লেখা "রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি তিনি রবিবাসরে পাঠ করবার পর সেখানে উপস্থিত সদস্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখাটি চেয়ে নিয়ে তাঁর সম্পাদিত বৈশাখের গল্পভারতীতেই ছেপে দেন। সেটি নিয়ে সন্তোষবাবু রবিবাসর-সদস্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সহায়তায় কলেজ স্ট্রীটে "মৌচাক" অফিসে হিতেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু তখন হিতেনবাবু বন্দেমাতরম গানের রেকর্ডের বিষয় স্মরণ করতে পারেন নি। এবার এইচ. বোসের রেকর্ড ক্যাটালগের পৃষ্ঠায় সে রেকর্ডের বিবরণ ফটো-কপিতে দেখে বললেন সে রেকর্ড খুব ছোটোবেলায় দেখেছেন মনে পড়ছে। তবে স্বদেশী গান ধ্বংস করবার জন্য পুলিস সব রেকর্ড বাজেয়াপ্ত করেছিল। তখন বসু পরিবার বাস করতেন শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে। সেখান হতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে নতুন বাড়িতে আসবার সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেকর্ড কোম্পানির কাগজপত্র যদি এ বাড়িতে কিছু এসে থাকে তবে হয়তো খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

সন্তোষবাবু তখন থাকতেন ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীটে, তাই মাঝে-মাঝে হিতেনবাবুর কাছে যাওয়া সম্ভব হত। একদিন সকালে তিনি পথে বেরুলে হিতেন-বাবুর ছোটো ভাই (সুধীনবাবু)-এর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, তাঁর দাদার অসুখ বেড়েছে। তিনি জানতে চাইছেন, সন্তোষবাবুর "কবিকণ্ঠ" বই কবে বেরুবে। বইটা বোধহয় তিনি আর দেখে যেতে

পারবেন না।

সন্তোষবাবু তখনই হিতেনবাবুর কাছে গেলেন। তাঁর শোবার ঘরে এক বৃদ্ধা বসেছিলেন। তিনি হিতেনবাবুর মা হবেন মনে হয়। কারণ তিনি যখন হিতেনবাবুকে রেকর্ডের বিষয়ে বলতে শুনলেন তখন নিজেই বললেন—নিচে গুদামঘরে বড়ো একটা ট্রাংক-ভরতি রেকর্ড কোম্পানির কাগজপত্র রাখা হয়েছিল। শিবনারায়ণ লেন থেকে আনবার পরে আর সে ট্রাংক খোলা হয় নি। সেটা একবার খুলে দেখতে বললেন তিনি।

হিতেনবাবুর অনুরোধে তাঁর ছোটো ভাই সন্তোষবাবুকে সঙ্গে করে ও বাড়ির একতলায় গুদামঘরে খুঁজে সেই পুরাতন ট্রাংক পেলেন এবং তার ভিতর পাওয়া গেল একখানি 'বন্দেমাতরম্' গানের রেকর্ড, যার এক পিঠে লেখা—36250 'বন্দেমাতরম্' sung by Mr. Rabindranath Tagore, অপর পীঠে 'সোনার তরী' 36369 By Mr. R. N. Tagore.

গুদামে সন্ধান করে এডিসনের স্বাক্ষরিত C 6616 নম্বর যুক্ত পিতলের প্লেট লাগানো একটি বিকল ফনোগ্রাফ যন্ত্রও পাওয়া গেল। সেটি কেরোসিন দিয়ে মুছে নিয়ে ১১" রেকর্ডখানি এবং মেশিনটির ফটো ওই বাড়িতে বসেই তোলালেন সন্তোষবাবু। "কবিকণ্ঠ" গ্রন্থে সেই ফটোসমূহ এবং তাম্রফলকে লেখা মেশিনটির বিবরণ ছাপা হয়েছিল। বিশ্বভারতীর কর্মী ক্ষিতীশ রায়ের লেখা Voice of Rabindranath Tagore গ্রন্থে হুবহু সেই সবই উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্তোষবাবু বললেন—পরে ও বাড়িতে ওই রেকর্ডের আরও কপি খুঁজে পাওয়া গেছে বলে তিনি এইচ. বোসের পৌত্র অনুপকুমারের কাছে শুনেছেন। কিন্তু সেই ১৯৬১ সালে তাঁর অনুসন্ধানের আগে পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কেউ আগ্রহী হন নি। ড. সুকুমার সেনের কাছে ১৯৫৪ সালে ক্যাটালগে পাথুরে প্রমাণ পাওয়ার পর ১৯৬১ সালে আসল রেকর্ডখানি হাতে পাওয়া—এই দীর্ঘ আট বৎসর সন্তোষবাবু মাঝে-মাঝে হিতেনবাবুর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পক্ষ হতে কোনো চেষ্টা দেখা যায় নি। এটা সম্ভব হয়েছিল সন্তোষবাবু হিতেনবাবুর নিকট প্রতিবেশী হিসাবে আমহার্স্ট স্ট্রীটেই বাস করতেন বলে, তাই এই যোগাযোগ নেহাত বিধিনির্বন্ধ বলা ছাড়া আর কিছু বলে তিনি দাবি করতে চান না। তা ছাড়া, তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে কর্মসূত্রে দীর্ঘ তিরিশ বছর ছিলেন বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড নিয়ে এভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিল।

"কবিকণ্ঠ" সম্পর্কে তিনি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় চিঠি ও আলোচনা দেখান। এখানে তাও তুলে দিচ্ছি :

'রবীন্দ্রভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবিবাসরের সদস্য ছিলেন।

১ বালিগঞ্জ টেরাস,
কলিকাতা-১৯
১৩।৪।১৯৭৮

প্রীতিভাজনেষু,

আমাদের বাড়িতে রবিবাসরের সাম্প্রতিক সভার দিনে "বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক আপনার রচিত পুস্তিকা আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। পুস্তিকাখানি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। যেমন আপনার লেখায় দেখা যায়, প্রবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ ফলে অনেক নূতন তথ্য জানা যায়।

এইচ. বোস নির্মিত রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্-এর 'cylindrical record' যে আপনি আবিষ্কার করেছিলেন তা জানতাম না। তা জেনে খুব খুশী হয়েছি। তাঁর পুত্রের কাছ থেকে আমি এই রেকর্ড রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালার জন্য কিনেছিলাম। তার টেপ রেকর্ড এখানে সংরক্ষিত তবে রেকর্ডখানি এত জীর্ণ যে স্বর ভালো বোঝা যায় না। তবু তা অমূল্য।

আশাকরি কুশলে আছেন। অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি আপনার

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সন্তোষবাবু যে রেকর্ডখানি খুঁজে বের করেছিলেন সেটি cylindrial record নয়, ১১" ডাবলসাইডেড ডিস্‌ক্ রেকর্ড, ফ্রান্সে প্যাথে কোম্পানিতে তৈরি, যাতে এইচ. বোসের তৈরি দুইটি সিলিণ্ডার হতে 'বন্দেমাতরম' গান ও 'সোনার তরী' আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠের অবিস্মরণীয় রেকর্ডিং তোলা হয়েছিল। এখনও রেকর্ডখানি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে।

বিশিষ্ট সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র (শার্ঙ্গদেব) "দেশ" পত্রিকায় 'গানের আসর' বিভাগে ২৫ আশ্বিন ১৩৭৫ (১১ অকটোবর ১৯৬৮) সংখ্যায় ১৬৩০ পৃষ্ঠায় "কবিকণ্ঠ" সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

'কবিকণ্ঠ গ্রন্থখানি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই গ্রন্থটি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হলেও সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। এর পুনঃপ্রকাশ নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। কেননা এটি এমন একটি গবেষণা যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সন্তোষবাবু রেকর্ড জগতে থাকায় তাঁর পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা থেকে জানা গেল যে, তিনি (অর্থাৎ সন্তোষবাবু) বৎসরের পর বৎসর যেভাবে এই কার্যে অনুসন্ধান করেছেন তা বনেদি গবেষকসমাজেও দুর্লভ। বস্তুত এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থটিতে আমাদের দেশে রেকর্ড-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ কি করে ঘটেছে সেইটিও জানানো হয়েছে। এই ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক।

'রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সে কি কি গান কিভাবে রেকর্ড করা হয়েছে তার ইতিবৃত্ত জানতেও সকলেরই বিশেষ ঔৎসুক্য থাকবার কথা। সন্তোষবাবু অতি যত্নের সঙ্গে সেইসব তথ্য আমাদের গোচর করেছেন। (রেকর্ডে) রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করাও কম দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। এই কাজটিও বিশেষ পরিশ্রমসহকারে করা হয়েছে।

'রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক পরিচয় জানতে গেলেও এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। যেসব প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ডিগ্রী ডিপ্লোমা প্রদান করেন, তাঁরা এটিকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা জানি না। অন্তত করাটা খুবই আবশ্যক বলে আমাদের মনে হয়।

'গ্রন্থের চিত্রগুলিও তথ্যের প্রমাণ হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইগুলি জোগাড় করতেও কম পরিশ্রম হয় নি। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতে গবেষণার একটি নতুন দিক খুলে গেছে। এইভাবে আরও অনেক খ্যাতনামা কবি ও গায়কের গান সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারা যাবে।

'সন্তোষবাবুর কাছে আমাদের অনুরোধ, কবি অতুলপ্রসাদ সেনের যেসব গান রেকর্ড করা হয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তিনি প্রস্তুত করুন। বর্তমানে আমরা এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।'

অতুলপ্রসাদের গানের রেকর্ড-তালিকা সংকলনে পুলিনবিহারী সেনও সন্তোষবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন। সে বিষয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েও তিনি তাগাদা জানিয়ে যে চিঠি জানিয়েছেন তার তারিখ দেখলাম ১১ অকটোবর, ১৯৭১। "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকার 'অতুলপ্রসাদ' সংখ্যার জন্যও একটি প্রবন্ধের অনুরোধ আসে। সেই প্রবন্ধটি সন্তোষবাবু অনেক পরিশ্রম করে লিখেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাগজ হয়েও তা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে দেখে সন্তোষবাবুকে নিম্নোক্ত পত্রখানি লেখেন—

Block B, Flat 6
37 Belgachia Road
Calcutta-37
June 16, 1979

শ্রীসন্তোষকুমার দে
১৪৬ কবি নবীন সেন রোড
কলিকাতা-২৮

সুচরিতেষু,

আপনার ১৩ জুন তারিখের পত্র পেয়েছি। 'তত্ত্ব-কৌমুদী'-র 'অতুলপ্রসাদ' সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশের উদ্যোগপর্ব চলছে। আপনার রচিত নিবন্ধটি নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। আপনি পরিশ্রম করে যে নিবন্ধটি রচনা করেছেন তা আর কারও দ্বারা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। এর গবেষণামূল্য অসীম। আমরা এটিকে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার অন্যতম সম্পদ বলে গণ্য করি। নানা কারণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে বলে অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। আশা করি নিজগুণে ত্রুটি মার্জনা করবেন। প্রকাশের পর পত্রিকা নিশ্চয় আপনার নিকট প্রেরিত হবে।

প্রীতিনমস্কারান্তে বিনীত
দিলীপকুমার বিশ্বাস

১৩।১০।১৯৬৩ তারিখে খ্যাতনামা সাহিত্যিক জরাসন্ধ "কবিকণ্ঠ" গ্রন্থখানি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পত্রে আলোচনা করেন। ড. নীলরতন সেন উচ্ছ্বসিত আলোচনা করেন 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' পত্রিকায়।

'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থ প্রকাশের আঠারো বৎসর পরে দৈবাৎ দুজন রেকর্ড-সংগ্রাহক বাতিল-হওয়া রেকর্ড স্তূপের মধ্য হতে একখানি sample রেকর্ডের সাদা লেবেলে 'তোমার সুরের ধারা'—Poet and Rama Debi লেখা দেখে রেকর্ডখানি সন্তোষবাবুর কাছে নিয়ে আসেন। সন্তোষবাবু পুনঃপুন বাজিয়ে সেটিকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একমাত্র দ্বৈতসঙ্গীতের রেকর্ড বলে চিহ্নিত করেন এবং সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য শান্তিনিকেতনে যান। পরে "দেশ" ১৫ নভেম্বর ১৯৮০ সংখ্যায় একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন : (কবিকণ্ঠের একটি অজ্ঞাত রেকর্ড—পৃ ১১-১৩)। তারই অনুসরণ করে আরও তথ্যাদি প্রকাশ করেন "কথাসাহিত্য" আশ্বিন ১৩৮৮ সংখ্যায় (রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এক অবিস্মরণীয় শিল্পী—পৃ ১৪৬১-৬৯)। পরে "পরিবর্তন" ৭-১৩ মে, ১৯৮৬ সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড-সংকলন বের করা দরকার (পৃ ৩১-৩৪) শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীযুক্ত নিমাইসাধন বসুর নিকট পত্রসহ পাঠান। পত্রোত্তরে উপাচার্য তাঁকে জানান, বিষয়টি তিনি যথাস্থানে পাঠিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন। অচিরে গ্রামোফোন কোম্পানি হতে শঙ্খ ঘোষের সংকলনে 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : হে মহাজীবন' নামে একটি ক্যাসেট বা রেকর্ডের একটি বিশেষ উৎসর্গ গত বৈশাখ ১৩৯৬ প্রকাশিত হয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দ্বৈতসঙ্গীতের রেকর্ডখানির টেপ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. শঙ্খ ঘোষ সন্তোষবাবুকেই অনুরোধ করে পত্র দিয়েছেন দেখলাম। সে ব্যবস্থাও যাতে সুসম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন।

২৫ বৈশাখ ১৩৭৩ (৯ মে ১৯৬৬) কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডে রবীন্দ্রসদনের উদ্বোধন হয়েছিল 'কবিকণ্ঠে বন্দেমাতরম' বাজিয়ে। এটি হয়েছিল প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশক্রমে। সেদিন আমার সঙ্গে সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল অমৃত-বাজার পত্রিকায় "Much Valued National Treasure" শিরোনামায়। 'কবিকণ্ঠে বন্দেমাতরম' নামে আমার প্রবন্ধ বেরিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার ওই দিনের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। সঙ্গীত-শাস্ত্রী অমিতাভ ঘোষ তাঁর 'বিশ্ববীণা' পত্রিকায় এপ্রিল / জুন ১৯৬৭ সংখ্যায় একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন (পৃ ১০৯-১১৪)। এ রেকর্ড সম্পর্কে

স্বর্গীয় চপলাকান্ত ভট্টাচার্য জওহরলাল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধীকে ধরেন। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরার হস্তক্ষেপে আকাশবাণী হতে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। তবে সবচেয়ে স্মরণীয় আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের ২৬ বৈশাখ ১৩৭৩ তারিখের পত্র। তাতে তিনি সন্তোষবাবুকে লেখেন—

'…কাল তোমার লেখা (কবিকণ্ঠে বন্দেমাতরম) আনন্দবাজারে পড়ে খুব খুশি হয়েছি। খুশি হয়েছি দুই কারণে—(১) রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম গান এবং তার সুর ধরে রাখার এবং প্রচারের মূল্য অসীম। এতদিন পরে (৬০ বছর) তার উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রচার যে কত গৌরবের ও আশার কথা তা বলে শেষ করা যায় না। (২) আর তার মূলে রয়েছ তুমি। এটা আমার পক্ষে পরম গর্ব ও সৌভাগ্যর কথা। কাল রাত্রে রেডিওতে কবিকণ্ঠে দুইবার বন্দেমাতরম্ গান শুনলাম। মনে হল এতদিন বেঁচে থাকা সার্থক হল—"সার্থক জনম মাগো শুনেছি এই গান।"

মতামত

১

"দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর"

"চতুরঙ্গ" সেপটেমবর ১৯৮৯ সংখ্যায় শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ "দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর" পড়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি। লেখকের বক্তব্য ঋজু, যুক্তিতীক্ষ্ণ এবং বিষয়বিন্যাসে তিনি যে মুনসিয়ানা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর-এর চিন্তা ও বিশ্বাসের জগৎ সম্বন্ধে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ, তথ্যনির্ভর, মনোজ্ঞ রচনা অন্যত্র পড়ি নি। আপনার পত্রিকার মাধ্যমে লেখককে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

লেখকের একটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে; সেই মন্তব্য পেশ করছি। লেখক বলেছেন, দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুক্তির পথ পরিহার করে নিছক আধিবিদ্যক বিশ্বাস সম্বল করে রামেন্দ্রসুন্দর অদ্বৈতবাদে পৌঁছেছেন; এ এক বিস্ময়কর পশ্চাদপসরণ। আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারছি না। সামনে এগিয়ে যাওয়া আর পিছিয়ে পড়া—দুটো ব্যাপারই আপেক্ষিক। কাজেই কোন্ মানদণ্ডে এই তথ্য বিচার করা হচ্ছে সেটাই লক্ষ করবার ব্যাপার। অন্যত্র লেখক যথার্থই বলেছেন যে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য এক হলেও তাঁদের প্রণালী, পথ ও ভাষা স্বতন্ত্র। একথা বলেও লেখক অভিযোগ করেছেন, যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাসের কাছে স্পষ্টই পরাভূত হয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানমনস্কতা। লেখক কি বলতে চান যে, দার্শনিক তাঁর বিচারপদ্ধতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন না করেও বিজ্ঞানমনস্কতা বজায় রাখবেন?

প্রশ্ন হল, দার্শনিক যদি বিজ্ঞানীর পন্থা অবলম্বন না করেন তবে তাঁর পথ কী হবে? এই প্রশ্নের জবাবে বেদান্তী বলেন, দার্শনিককে অবশ্যই যুক্তিতর্ক অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু যে তর্কের মূলে অপরোক্ষানুভূতি নেই, সে তর্ক কিন্তু অসার্থক বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে পথ হল অপরোক্ষানুভূতি যার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বেদান্তীর মতে, ছটি প্রমাণ আছে—তার মধ্যে শব্দপ্রমাণ অন্যতম। শব্দ অর্থাৎ এক্ষেত্রে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান দেবে আর সেই সত্য আমি অপরোক্ষানুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারব। অপরোক্ষানুভূতির ক্ষেত্রে চিৎ সাক্ষাৎভাবে চিৎকেই উপলব্ধি করে, মন বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। যেহেতু ব্রহ্ম অবিষয়, গাছ, পাহাড়, নদী, বই, কলম প্রভৃতির মতো বস্তু বা বিষয় নয়, সেজন্য যে মননক্রিয়ার সাহায্যে বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান হয়, সেই মনন ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে না। সেইজন্য উপনিষদে বলা হয়েছে: মনসা ন মনুতে—মনের দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যাবে না। আবার একথাও বলা হয়েছে: মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্। মন দিয়েই তো জানতে হবে। এই বিরোধের সমাধান করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ব্রহ্ম মনের অগোচর ঠিকই; কিন্তু তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। ব্রহ্মোপলব্ধি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেছেন, যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ……বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ? ব্রহ্মবিদের কাছে যখন সবকিছুই আত্মায় বিলীন হয়ে যায়, তখন কে কাকে জানবে? কে কাকে শুনবে? কে কাকে চিন্তা করবে? যাঁর সাহায্যে লোকে বস্তুনিচয়কে জানে, তাঁকে কিসের দ্বারা জানবে? অর্থাৎ যতক্ষণ দ্বৈত অবস্থা ততক্ষণ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ভাব থাকে। কিন্তু দ্বৈত তিরোহিত হলে জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া, জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটি বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের রহস্য এইখানে। ব্রহ্মকে বিষয়রূপে জানা যায় না, অথচ তাঁকে আমরা বিষয়রূপেই জানার চেষ্টা করছি। এই রহস্যের কথা বিভিন্ন উপনিষদ্ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন, কেনোপনিষদ্ বলেছেন, যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ, অর্থাৎ যাঁর মনে নিশ্চিত ধারণা আছে যে তিনি ব্রহ্মকে জানেন না, ব্রহ্ম তাঁর কাছেই সম্যক্ জ্ঞাত। আবার যিনি নিশ্চয় করে বলেন যে আমি ব্রহ্মকে জেনেছি, তিনি ব্রহ্মকে কিছুমাত্র জানতে পারেন নি। এইসকল স্ববিরোধী বাক্যের তাৎপর্য এই যে বিজ্ঞান মন ও বুদ্ধির সাহায্যে যেভাবে বস্তুকে জানে, ব্রহ্মকে সেভাবে জানা যায় না, কারণ ব্রহ্ম অবিষয়। আবার একথা ভুললে চলবে না যে ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্, অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ববিষয়ের অনুভবকর্তা, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এটাই সর্ববেদান্তের উপদেশ। আত্মা হচ্ছেন প্রতিবোধবিদিতম্, অর্থাৎ প্রত্যেক বোধের কাছেই আত্মা বিদিত। চোখ, কান, মন প্রাণ—এরা হচ্ছে করণ। যাঁর কর্তৃত্বে এই করণগুলি কার্যে প্রবৃত্ত হয় তিনি চৈতন্যসত্তা।

রামেন্দ্রসুন্দর যদি বিচার-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে, অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যে অথবা গভীর বিশ্বাসের মাধ্যমে অদ্বৈতবাদে পৌঁছে থাকেন, তাহলে দোষ কী? বিজ্ঞানীও তো একটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বস্তুবিশ্বের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেছেন, There also belongs the faith in the possibility that the regulations valid for the world of existence are rational, that is, comprehensible to reason. I cannot conceive of a genuine scientist without that profound faith. 'মানুষ বুদ্ধিবিচারের সাহায্যে সত্যে উপনীত হতে পারবে'—এটা পরীক্ষিত সত্য কিনা সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিজ্ঞানী এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। 'পরাবিদ্যার ক্ষেত্রে শ্রুতিই প্রমাণ' অথবা 'অপরোক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়'—এই-জাতীয় বিশ্বাসকে অবলম্বন করে যদি রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর দার্শনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হয়ে থাকেন তবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে পশ্চাদপসরণ বলা সঙ্গত হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার। প্রাচীন (classical) বিজ্ঞানে বস্তুর প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকার করা হত; প্রমাতা বা বিষয়ী ছিল গৌণ। আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম্ মেকানিক্স্-এর আবির্ভাবের ফলে জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে প্রমাতা বা বিষয়ীর ভূমিকা কতটা মূল্যবান, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ সচেতন। Lincoln Barnett তাঁর *The Universe and Dr Einstein* গ্রন্থে বলেছেন, 'Least of all does he (man) understand his noblest and most mysterious faculty: the ability to transcend himself and perceive himself in the act of perception.' আবার ড. Fritjof Capra তাঁর *The Tao of Physics* গ্রন্থে বলেছেন, 'The basic oneness of the universe is not only the central characteristic of the mystical experience, but is also one of the most important revelations of modern physics,' দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে তা অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিন্ন। এই দিক থেকে বলা যায়, রামেন্দ্রসুন্দর দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে অদ্বৈতবাদে উপনীত হয়েছেন তা 'অবৈজ্ঞানিক' নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য স্মরণে রাখতে হবে। দার্শনিক যখন তাঁর প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান তখন তাঁকে যুক্তি তর্কের সাহায্য নিতেই হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। গ্রীন Eternal Consciousness-এর কথা যখন বলেছেন তখন তাঁর যুক্তিপ্রয়োগ ছিল এইরকম: বস্তুজগতে ঘটনাপরম্পরা কালের মধ্যে বিধৃত; এই অনুভূতি যাঁর বিষয়গোচর সেই জ্ঞাতা কিন্তু কালের

অন্তর্গত হয়ে থাকেন না; তিনি এক অর্থে কালকে অতিক্রম করে থাকেন। আবার কান্ট যখন তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি অপরকে বোঝাতে চেয়েছেন তখন তিনি যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তাও যুক্তি-সহ, সেই পদ্ধতির নাম transcendental method। এখানেও যুক্তিতর্কের ভূমিকা মুখ্য।

লেখক যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তার জবাব হিন্দুশাস্ত্রে বহুবার বহুভাবে দেওয়া হয়েছে। কে এই ব্রহ্ম? এই প্রশ্নের জবাবে অদ্বৈতবাদী বলেছেন, আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। "আমি নেই" বলতে গেলেও নিষেধক্রিয়ার কর্তারূপে "আমি"-কে থাকতে হবে। ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ দাবি করা অসঙ্গত। কারণ আত্মা সম্বন্ধে যখন সংশয় থাকে না, তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ নেই। আর যেখানে সংশয় নেই, সেখানে প্রমাণের কথা ওঠে না। কেন এই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা জীবাত্মারূপে জগতের নিয়মাধীন হলেন? এই প্রশ্নের জবাবে অদ্বৈতবাদী বলেন, লীলাবশে তিনি জগতের নিয়মাধীন হয়েছেন। এই জবাবগুলি প্রাগুক্ত লেখকের কাছে সন্তোষজনক মনে না হতে পারে। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র। বুদ্ধি-বিচার ও বিতর্কের শুদ্ধ বা পরিণত রূপ যে অনুভূতি, সেই অনুভূতির মাধ্যমে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, মননের দ্বারা নয়। কঠোপনিষদ বলছেন, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। দুটি কথা যদি মনে রাখি যে, ব্রহ্ম অবিষয় এবং প্রবচন, মেধা, মনন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, তাহলে হয়তো সহানুভূতির সঙ্গে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক মতের নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে পারব।

অমিয়কুমার মজুমদার
কলকাতা

২

প্রসঙ্গ : আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প

গত সেপটেম্বর, ১৯৮৯-এর "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় সুজিৎ ঘোষ লিখিত "আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প" প্রবন্ধটি পাঠ করলাম ও আধুনিক বাঙলা কবিতায় মননশীল কিছু চিত্রকল্প-বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হলাম। প্রবন্ধলেখক বাঙলা কবিতায় চিত্রকল্পের যে শ্রেণীবিভাগ করে দেখিয়েছেন তা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য। বিশেষত ইংরাজিতে, তাঁর কথামতো, image শব্দটির দ্বারাই যখন সব রকমের চিত্রকল্পকেই বোঝায় তখন তাঁর এই প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই। পাঠকমাত্রই নিশ্চয়ই ঐকমত্যে পৌঁছোবেন যে আধুনিক কবিতা ব্যঞ্জনা পায় চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগের দ্বারাই। যদিও অনেকের মতে আধুনিক কবিতা শব্দব্রহ্মের মতোই শব্দনির্ভর এবং এক-একটি সুনির্বাচিত শব্দ চয়নের দ্বারা কবিতার আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও চিত্রকল্পও যে কবিতার ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতেও সক্ষম, কারও-কারও এই মতটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, প্রাচীন বা ধ্রুপদী কাব্যে চিত্ররূপকল্প আছে। যদিও প্রবন্ধলেখকের মতে সে-সব চিত্ররূপকল্প জন্ম নিয়েছে মহাকবিদের অচেতন মন থেকে, তবুও এ কথা স্মর্তব্য যে মহাকবিদের লেখনীজাত সেইসব অবচেতন মনের চিত্ররূপকল্প দীর্ঘ সময় পার হয়ে পাঠকের মনের দুয়ারে ঘা দিতে সক্ষম। এ কথা কারও অবিদিত নয় যে মহাকবি দান্তের ইমেজ সৃষ্টি পৃথিবীর সাহিত্যে একটি অতুলনীয় সম্পদ। প্রবন্ধ-লেখক চিত্ররূপকল্পের শ্রেণীবিন্যাস ও উদাহরণের দ্বারা সেগুলি ব্যাখ্যা করার পর আধুনিক বাঙলা কবিতায় চিত্ররূপকল্পের মিশ্রণ কিভাবে দেখা দিয়েছে সে প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কোথায় এক শ্রেণীর চিত্রকল্পের সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর চিত্রকল্প মিশে গেছে এবং তার দ্বারা

কেমন রসোত্তীর্ণ কবিতার সৃষ্টি হয়েছে—আয়াসসাধ্য এই বিশ্লেষণের প্রবন্ধটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবু এই প্রসঙ্গে একজন কবির কবিতা স্মর্তব্য বলে মনে হল। র‍্যাঁবো যাকে বলেছিলেন 'কবির কবি' সেই ফরাসি কবি বোদলেয়ারের কথাই স্মরণ করছি। যদিও এই মহান কবি আধুনিক কবি ছিলেন না (হয় তিনি রোম্যানটিক, নয় ছিলেন ফরাসি প্রতীকী কবিদের অন্যতম পুরোধা), তবু তাঁর অনেক রচনাই আধুনিক কবিদের প্রভাবস্থল। এই কবির কবিতাতেই প্রথম চিত্রকল্পের মিশ্রণ ব্যাপারটি লক্ষণীয়রূপে উপস্থিত। তাঁর এই বহুবিখ্যাত কবিতাটির নাম "করেসপনডেনস" নামটিও এখানে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কবিতায় চিত্রকল্পের মিশ্রণের পশ্চাতে ইন্দ্রিয়সমূহের পারস্পরিক যোগের একটি কারণ আছে। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্বাদ ও ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছে তাঁর "করেসপনডেনস" নামে কবিতাটির চিত্রকল্পগুলির। তাই ধ্বনি (সাউনড) বিশাল স্তম্ভের রূপ পরিগ্রহ করে, ঘ্রাণও রূপলাভ করে তাঁর কোনো একটি কবিতায়। কুসুমের গন্ধও রূপ লাভ করে, দৃশ্যরূপকল্পের উদাহরণ হওয়ার জন্যে। তাই 'ধূপের ধোঁয়ার মতো ফুলের সৌরভ' চরণটি সেতু রচনা করে ঘ্রাণ ও দর্শনের মধ্যে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আধুনিক বাঙলা কবিতার চিত্ররূপকল্পের মিশ্রণের যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় সেগুলি প্রসঙ্গে ফরাসি কবি কার্ল বোদলেয়র রচিত উল্লিখিত কবিতাটি অবশ্য স্মরণীয়।

অশোক মৈত্র
কলকাতা